পাগল মামার চার ছেলে

প্রফুল্ল রায়

পাগল মামার চার ছেলে

প্রফুল্ল রায়

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
বইমেলা
জানুয়ারি, ১৯৮৭

দ্বিতীয় সংস্করণ :
আষাঢ়, ১৩৯৫
জুন, ১৯৮৮

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
ধীরেন শাসমল

মুদ্রাকর :
শ্রীদুলালচন্দ্র ঘোষ
নিউ লোকনাথ প্রেস
৮এ কাশীবোস লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম : ১০ টাকা

আমার স্নেহের বাজুদাদাকে

বড় হয়ে তুমি এই বই পড়বে, সেই আশায়

এই লেখকের ছোটদের বই :

সেনাপতি নিরুদ্দেশ

তিন মূর্তির কীর্তি

পাগল মামার চার ছেলে

পাগল মামার চার ছেলে
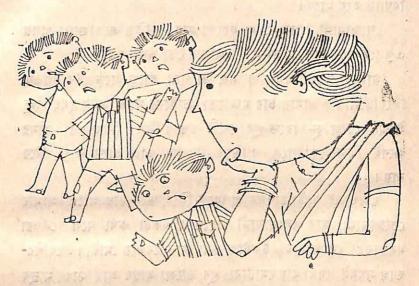
আমার সেজোমামার নাম পাগলচাঁদ সমাজপতি। এই একটা নামই তাঁকে প্রায় পাগল করে তুলেছিল। রাস্তায় বেরুলেই কেউ ডাকে 'এই যে পাগলবাবু', কেউ ডাকে 'এই যে পাগলচন্দ্র', কেউ বলে 'পাগলাদা'।

এতবার পাগল শুনলে কার না মাথা খারাপ হয়ে যায়। উপায় থাকলে নামটা কবেই পাল্টে ফেলতেন সেজোমামা। কিন্তু ওটা তাঁর বাবা, মানে আমাদের দাদুর দেওয়া নাম। তা-ছাড়া ম্যাট্রিক থেকে এম-এ পর্যন্ত যত সার্টিফিকেট আর ডিগ্রী পেয়েছেন, সবগুলোতেই লেখা আছে পাগলচাঁদ সমাজপতি। মনে অনেক দুঃখ থাকলেও তাই নামটা আর বদলানো যায় নি।

নিজের বেলা তো পারেন নি, তাই সাধ মিটিয়ে চার ছেলের নাম

দিয়েছেন—প্রলয়নাচন, প্রলয়মাতন, প্রলয়নাশন, প্রলয়ঘাতন। অবশ্য ওদের একটা করে ডাকনামও আছে। আবু, টাবু, হাবু এবং পাবু। সেজোমামা সগর্বে সেজোমামীকে বলেছেন, কেমন নাম দিয়েছি বলো তো? ঐ নামের জোরে আমার ছেলেরা পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে যাবে।

সেজোমামী বলেছেন, তা হয়তো হবে। কিন্তু এতোগুলো প্রলয় একসঙ্গে ঘরে এনে ঢোকালে। আমার তো ভয়ই করছে।

মামীর ভয়টা যে মিথ্যে নয়, তা পরে হাড়ে-হাড়ে টের পাওয়া গিয়েছিলো। আমার চার মামাতো ভাইয়ের মতো এমন দুর্ধর্ষ বিচ্ছু ইরম্মদ ছেলে ভূ-ভারতে খুব বেশি জন্মায় নি। নিজেদের নামের গুণেই কিনা কে জানে, বাড়িতে দিনরাত তারা প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়ে যায়।

যদিও এই গল্পটা চারজন প্রলয়কে নিয়ে, তবে তার আগে আমার সেজোমামা আর সেজোমামী সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। সেজোমামা টকটকে ফর্সা আর বেজায় মোটা। বেশির-ভাগ সময়ই দেখা যায় মোটারা খুব ভালো মানুষ আর ঠাণ্ডা মানুষ হয়। আমার সেজোমামাও তাই। নাকের তলায় স্যার আশুতোষের মতো গোঁফ। সব সময় হাসিখুশি। সারাক্ষণ তাঁর পরনে থাকে গালিশ—দেওয়া ঢলঢলে ফুলপ্যাণ্ট। শার্টের বোতাম লাগাতে, জুতোর ফিতে বাঁধতে আর দাঁড়ি কামাতে প্রায়ই ভুলে যান তিনি।

একটা ওষুধ কোম্পানিতে বড় চাকরি করেন সেজোমামা, সারা বছরই তাঁকে হিল্লী-দিল্লী করে বেড়াতে হয়। এ মাসে যদি গৌহাটি যান, আসছে মাসে ভূবনেশ্বর, তার পরের মাসে জব্বলপুর বা এলাহাবাদ।

সে যাই হোক, ছেলেদের কীর্তিকলাপ দেখে সেজোমামার মতো ঠাণ্ডা মানুষেরও রক্ত একেক দিন মাথায় চড়ে যায়। হুঙ্কার দিয়ে বলেন, সব ক'টাকে বাড়ি থেকে বার করে দেব।

সেজোমামী একেবারে সেজোমামার উল্টো, ভয়ানক রোগা, গায়ে মাংস-টাংস নেই, শুধু হাড়, বারো মাস ভোগেন। মাপ নিলে সেজো-মামার চারভাগের এক ভাগ হবেন, চার ছেলের জ্বালায় সারাক্ষণ পাগল হয়ে থাকেন। তার ওপর অসুখ-বিসুখ তো আছেই। দুর্বল গলায় দিনরাত চেঁচিয়ে যান, এদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে পারে এমন কি কেউ নেই? কিন্তু সেজোমামী যতই চিৎকার করুন, প্রলয়নাচন প্রলয়মাতনরা তা গ্রাহ্যই করে না।

সেজোমামারা অনেকদিন শ্যামবাজারে ছিলেন। কিন্তু সেখানে বাড়িটা ছিল খুবই ছোট, মোটে আড়াইখানা ঘর; বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। তাই পরশুদিন বাড়ি বদলে চেতলায় এসেছেন।

পুরানো আমলের এই একতলা বাড়িটা চমৎকার। পাঁচখানা বড়-বড় ঘর। সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, পেছনে বাগান।

পরশু এসেই কাল অফিসের কাজে রাঁচী যেতে হয়েছে সেজোমামাকে। ফিরবেন সাতদিন বাদে। এ ক'দিন নতুন জায়গায় একা সেজোমামীকে ছেলেদের সামলে রাখতে হবে। এখানে আসার পর পাশের বাড়ির বলাইবাবুদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। আর সবাই অচেনা। এবার আসল গল্পটা শুরু করা যেতে পারে।

আজ সকালে ঘুম ভাঙার পর মুখ-টুখ ধুয়ে আবু-টাবু-হাবু-পাবু চার ভাই ডাইনিং রুমে গিয়ে খেতে বসেছে। সেজোমামী প্রত্যেকের প্লেটে ডিমসেদ্ধ, কলা, রুটি, মাখন আর এক গেলাস করে দুধ দিয়েছেন।

পাবু চামচ দিয়ে তার ডিমটা কাটতে যাচ্ছিল, হাবু চেঁচিয়ে উঠল, 'কাটবি না পাবু, দাঁড়া—'

বলেই ছোঁ মেরে পাবুর প্লেট থেকে ডিমটা তুলে নিজের ডিমের পাশে রেখে মেপে দেখল, তারটা একটু ছোট। অমনি হাত-পা ছুঁড়ে লাফালাফি শুরু করে দিল, 'আমাকে ছোট ডিম দিয়ে পাবুকে বড়

ডিম দেওয়া চলবে না। ওকে আমি খুন করে ফেলব'—ব'লেই এক কামড়ে পাবুর ডিমের অর্ধেকটা খেয়ে ফেললো।

পাবুও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার ছেলে নয়। সেও দুধের গেলাস ছুঁড়ে মারলো হাবুর দিকে। পাবুর হাতের টিপও দারুণ। গেলাসটা হাবুর থুতনিতে গিয়ে লাগলো। মেঝেময় ডিম, পাউরুটি, মাখন আর দুধের স্রোত।

সেজোমামী দু'হাত তুলে সেই পুরনো কথাটা করুণ মুখে আরও একবার বললেন, 'এই চার দস্যুর হাত থেকে কেউ কি আমাকে বাঁচাতে পারে না?'

অদ্ভুত ব্যাপার। মামীর কথা শেষ না হতেই আচমকা কেউ যেন ঠাস্ করে হাবুর গালে বিরাশী ছক্কার একটা চড় কষালো, আর সে ঠিকরে পড়লো ওধারের দেওয়ালে। আবু আর টাবুর মাথা দু'টো আপনা হতেই ঠুকে গেল; সঙ্গে-সঙ্গে দু'জনের কপালে মার্বেল গুলি গজিয়ে উঠলো। তারপরেই দেখা গেল পাবুর কান দু'টো অদৃশ্য হাতে কেউ মুচড়ে দিচ্ছে।

মুহূর্তে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ থেমে গেল। কাউকেই দেখা যাচ্ছে না; অথচ তাদের মাথা, গাল আর কানের দশা কে এমন করে ছাড়ল, বুঝতে না পেরে বেজায় ভয় পেয়ে গেল পাবুরা। টুঁ শব্দটি না করে চার ভাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর স্কুলে যাওয়ার সময় পর্যন্ত বাড়িটা শান্ত হয়ে রইলো। অবশ্য চেতলায় আসার আগেই পাগল-মামা চার ছেলেকে এখানকার স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।

যুদ্ধ থামায় সেজোমামী খুবই খুশি হয়েছেন। তবে ভয়ও পেয়েছেন যথেষ্ট। তারা পাঁচজন ছাড়া অন্য কেউ ডাইনিং রুমে ছিল না। তা'হলে কে ওভাবে চড় মারল, কান মুললো, মাথা ঠুকে দিল? খুবই গোলমেলে ব্যাপার।

ছেলেদের স্কুল পাঠিয়ে সেজোমামী সোজা পাশের বলাইবাবুদের বাড়ি চলে গেলেন। ওরা কিছু জানলেও জানতে পারে। তেমন

হলে পাগলমামা ফিরে এলেই বাড়ি বদলাতে হবে।

সকালবেলার ঘটনাটা আগাগোড়া বলে গেলেন সেজোমামী। সব শুনে বলাইবাবুর মা পরম নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'এই কাণ্ড হয়েছে! কোনো ভয় নেই!'

সেজোমামীর উদ্বেগ কাটে না। তিনি বললেন, 'বিপদ-টিপদ হবে না তো?'

'আরে না-না। বরং উল্টোটাই হবে।'

'কে আমার বাঁদর ছেলেগুলোকে টিট্ করলো বলতে পারেন?'

'দু'-চার দিন থাকো, নিজেই বুঝতে পারবে। না পারলে বলো, আমি বুঝিয়ে দেবো।'

সেজোমামী বাড়ি ফিরে এলেন। বলাইবাবুর মা পরিষ্কার করে কিছু বললেন না। ফলে সেজোমামীর দুশ্চিন্তাটা থেকেই গেল।

বিকেলে স্কুল থেকে ফেরার পর পাগল মামার চার ছেলে আবার স্বমূর্তি ধারণ করলো। সকালের বেদম মারধোরের কথা তারা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভুলে গেছে। চার ভাইয়ের শোবার জন্য চারখানা ছোটো খাট রয়েছে। খাটগুলোর পায়ায় চাকা লাগানো। স্কুল থেকে ফিরেই জলখাবার খেয়ে খাট চারটি টেনে এনে ঘরের মাঝখানে জোড়া লাগায় ওরা। তারপর ক্যারম বা লুডো খেলতে বসে।

আজ ওরা লুডো খেলছে। একদলে আছে আজ পাবু আর আবু, অন্য দলে টাবু এবং হাবু। খেলাটা ভালোই চলছিল। হঠাৎ টাবু বাঁ হাতের কারসাজিতে একটা কাঁচা ঘুঁটিকে পাকিয়ে ফেললো। কিন্তু আবু-পাবুর চোখে ধুলো দেওয়া অত সোজা নয়। তারা চিৎকার করে উঠলো, 'চোট্টা, চোট্টা—চোরামি করে খেলছিস।'

টাবুরাও রুখে দাঁড়ালো, 'কক্ষণো না, কক্ষণো না। ওটা আমার পাকা ঘুঁটি।'

'মিথ্যুক, চোর, শয়তান—' বলেই লুডোটা উল্‌টে দিল পাবু।

তারপরেই চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সেজোমামী

পাশের ঘরে ছিলেন ; দৌড়ে এলেন এবং সরু গলায় চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন, 'মরবি, এক-এক করে তোরা একদিন নির্ঘাত শেষ হয়ে যাবি।'

মামীর কথা কারো কানেও ঢুকলো না। চার ভাই হাতাহাতি চালিয়েই যেতে লাগল।

অনেকক্ষণ চেঁচাবার পর ক্লান্ত হয়ে মামী তাঁর সেই পুরানো আর্জি-টাই আরও একবার শোনালেন। 'কেউ কি এই হতচ্ছাড়াদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারে না?'

কথা শেষ হবার আগেই তাজ্জব ব্যাপার। চারখানা খাট গড়-গড়িয়ে চার দেওয়ালে গিয়ে ঠেকল। কাজেই মারামারিটা তক্ষুনি বন্ধ হয়ে গেল। সকালবেলার মতো চার ভাই ভয়ে সিঁটিয়ে রইল।

ব্যাপারটা ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠছে।

মামীর কিন্তু ভয়টা পুরোপুরি কেটে গেল। তিনি বুঝতে পেরে-ছিলেন, হাতের কাছে একটা দারুণ জিনিস পাওয়া গেছে। শুধু মুখ ফুটে একটু আর্জি জানালেই হলো। মনে হচ্ছে সঙ্গে-সঙ্গে কাজ হবে। দুরন্ত, দুর্ধর্ষ ছেলেগুলোকে এতদিনে বশে আনতে পারবেন।

বিকেলের এই ঘটনার পর ঘণ্টা দু'য়েক বেশ ভালোভাবেই কাটলো। তারপর যেই সন্ধে নামলো, অমনি সেজোমামী চেঁচাতে শুরু করলেন, 'পড়তে বস রে, পড়তে বস রে—'

কিন্তু প্রলয়নাচন বা প্রলয়মাতনদের দেখে মনে হলো না যে মায়ের কথা তাদের কানে ঢুকেছে।

অগত্যা সেজোমামী কড়িকাঠের দিকে মুখ তুলে করুণ গলায় বল-লেন, 'এমন কেউ কি নেই, যে বজ্জাতগুলোকে কান ধরে পড়তে বসায়।'

ম্যাজিকের মতো কাজ হয়ে গেল। কার যেন অদৃশ্য হাত কান ধরে হিড়-হিড় করে টানতে-টানতে চার ভাইকে পড়ার টেবিলে বসিয়ে দিলো। সঙ্গে-সঙ্গে দেওয়ালের তাকগুলোতে, যেখানে ওদের বই থাকে, সেখান থেকে এর গ্রামার, ওর জ্যামিতি, তার ইতিহাস ধপাধপ

এসে আবু-টাবুদের সামনে পড়তে লাগলো। তার মানে এক্ষুনি পড়া শুরু করতে হবে।

কিন্তু চার প্রলয় এমনই ঘাবড়ে গেছে যে, কারো গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না। কি যে করবে, কেউই ভেবে ঠিক করতে পারলো না।

সেজোমামীও ছাড়বার পাত্রী নন। হাতের কাছে দারুণ একটা অস্ত্র পেয়ে গেছেন ; সেটা আবার কাজে লাগালেন। ওপরের দিকে মুখ তুলে বললেন, 'দত্যিগুলো একদম পড়ে না ; বছর-বছর ফেল করে। কেউ কি এদের পড়িয়ে দিতে পারে না ?'

বলা শেষ হলো কি হলো না, একজোড়া বেত কোত্থেকে যেন ঘরের ভেতর এসে হাওয়ায় নাচতে লাগল। চার ভাই ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। ওরা চুপচাপ তাকিয়ে আছে দেখে সপাং করে বেত দু'টো টেবিলের ওপরে আছড়ে পড়ল।

প্রলয়নাচন, প্রলয়মাতনরা বুঝল চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। চারভাই ঘাড় গুঁজে, গলা ছেড়ে পড়তে শুরু করে দিল। আর বেত দুটো ঘরময় হাওয়াতে ঘুরে-ঘুরে তাদের পাহারা দিতে লাগল।

দশটা পর্যন্ত পড়াশুনো করে, খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে গুটিগুটি গিয়ে শুয়ে পড়ল। অন্য দিন রাত্তিরে খাওয়া এবং শোওয়ার সময় ধুন্ধুমার বেধে যায়। আজ কিছুই হল না।

পরের দিন সকালে ডাইনিং রুমে খাবার-দাবারের ভাগ নিয়ে আবার পঞ্চম পাণিপথের যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়াইটা আজ বাধল না। লুচি-হালুয়া দেওয়া হয়েছিল চারভাইকে।

আবু টাবুর প্লেটের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'টেবো আমার চেয়ে বেশি হালুয়া পেয়েছে।'

ওদিকে হাবু চেঁচিয়ে উঠেছে, 'আমি পাবুর চেয়ে কম হালুয়া পেয়েছি।'

ছুঁড়বার জন্য চারভাই যখন প্লেট তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে, সেই সময় সেজোমামী কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে সেই কথাটি আবার বললেন, 'কেউ কি এই পাজীগুলোকে ঠাণ্ডা করতে পারে না?'

তখুনি কেউ যেন চারভাইয়ের হাত থেকে কাপ-প্লেট কেড়ে নিয়ে টেবিলে সাজিয়ে রাখল এবং তাদের কান ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিল।

অগত্যা ট্যাঁ-ফোঁ না করে প্রলয়নাচনেরা নিজের-নিজের ভাগের লুচি-হালুয়া খেয়ে সোজা পড়ার ঘরে চলে গেল।

মামী মুখ তুলে বললেন, 'আপনি কে জানি না। তবে আমার বড্ড উপকার করছেন। এখন থেকে আমার চার ছেলের বাঁদরামো ঘুচিয়ে ওদের ভাল করে দিন—' বলে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

ঘণ্টা দুই পড়াশুনো করে, স্নান সেরে খেয়ে চারভাই পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

স্কুলে যাবার নাম করে বেরুলেও বেশিরভাগ দিন তারা স্কুলে যায় না। রাস্তায় ডাংগুলি খেলে কিংবা অ্যালজেব্রা কি বাংলা ব্যাকরণের বই বেচে সিনেমায় দিয়ে দেখে।

আজ ওরা ঠিক করল, চেতলা ব্রিজ পেরিয়ে এসপ্ল্যানেডে ঘুরতে যাবে। কিন্তু তার আগেই কেউ যেন ওদের ঘাড় ধাক্কা দিতে-দিতে স্কুলের ক্লাসরুমে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল।

এরপর থেকে রোজ সকাল পাঁচটা বাজতেই, কে যেন চার ভাইকে বিছানা থেকে তুলে বাথরুমে পাঠিয়ে দেয়। মুখ-টুখ ধোয়া হলে এক জোড়া বেত তাদের ডাইনিং রুমের দরজা দেখিয়ে দেয়। ওরা যখন খায়, বেত দুটো হাওয়ায় নাচতে থাকে। খাওয়া হলে পড়ার ঘরে যখন আসে, বেতজোড়া তখনও পিছু ছাড়ে না। একটু ফাঁকি দিয়েছে কি, অমনি সপাং করে পিঠে বাড়ি পড়ে। স্কুল কামাই করারও উপায় নেই। অমনি গলা ধাক্কা দিতে দিতে কেউ তাদের ক্লাসে নিয়ে যাবে। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে টিফিন খাবার

সময় থেকে রাত্তিরে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত সারাক্ষণ বেতজোড়া ওদের সঙ্গে ঘুরতে থাকে।

সেজোমামী তো বেজায় খুশি। ছেলেদের পেছনে চেঁচিয়ে তার যে অসুখ করেছিল, তা এখন সেরে যেতে শুরু করেছে। রাঁচীতে সেজো মামাকে চিঠি লিখে তিনি সব জানিয়েছেন।

এদিকে প্রলয়নাচন প্রলয়মাতন প্রলয়খাশন প্রলয়মাতন, চার ভাইয়ের প্রলয় থেমে গেছে। পঞ্চম পাণিপথের যুদ্ধের লড়াই এ বাড়িতে আর হচ্ছে না। লড়াই তো দূরের কথা, জোরে কথা বলার পর্যন্ত উপায় নেই। তার ওপর রোজ নিয়ম করে স্কুলে যেতে হচ্ছে, বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়তে হচ্ছে। চার ভাইয়ের মনে আর সুখ নেই।

একদিন রাত্তিরে পরামর্শ করে তারা ঠিক করল, এখানে আর থাকবে না। রাত পোহাবার আগেই চেতলা ছেড়ে চলে যাবে। এখান থেকে ভোরের বাস ধরে যাবে হাওড়া স্টেশন। সেখান থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস, বোম্বে মেল—প্রথমে যে ট্রেন পাওয়া যাবে, তাতেই চড়ে বসবে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। চার ভাই মাকে চিঠি লিখে অন্ধকার থাকতে-থাকতেই বেরিয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে সেজোমামী দেখলেন, ছেলেদের ঘর ফাঁকা। টেবিলের ওপর একটা ভাঁজ করা কাগজ রয়েছে। সেটা খুলতেই দেখা গেল, কয়েক লাইন লেখা রয়েছে :

শ্রীচরণেষু মা,

তুমি নিশ্চয়ই ভূত পুষেছো। তার এত বেতের বাড়ি, কানমলা, চড় আর সহ্য হয় না। মার খেতে-খেতে সারা গায়ে কালসিটে পড়ে গেছে। দিনের পর দিন মাথা গুঁজে এতো পড়াশুনো করতে ভাল লাগে না।

তাই আমরা চলে যাচ্ছি। এ-জীবনে আর দেখা হবে না।

বাবা ও তুমি আমাদের প্রণাম নিও। ইতি—

হতভাগ্য

আবু-টাবু-হাবু-পাবু

অন্য সময় হলে এ চিঠি পড়ে সেজোমামী কেঁদে-কেটে সারা বাড়ি মাথায় তুলতেন। আজ কিন্তু কিছু করলেন না। নিজের মনে ঘরের কাজ করতে লাগলেন। তিনি জানেন যাঁর ওপর ওদের দায়িত্ব দেওয়া আছে, তিনিই ওদের ব্যবস্থা করবেন।

আটটা তখনও বাজে নি, দেখা গেল, লম্বা মোটা দড়ি দিয়ে চার ভাইকে বেঁধে অদৃশ্য কেউ টানতে-টানতে বাড়ি নিয়ে আসছে।

এরপর টাবুরা একেবারে আশা ছেড়ে দিয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে, বাঁদরামো করা চলবে না। ঘাড় গুঁজে দুবেলা পড়তে হবে, মারামারি বন্ধ করতে হবে এবং রোজ স্কুলেও যেতে হবে।

এসব ঘটনা ঘটে যাবার পর সেজোমামী আবার একদিন পাশের বাড়ির বলাইবাবুদের বাড়ি গেলেন এবং যা-যা হয়েছে সব বললেন।

সমস্ত শুনে বলাইবাবুর মা বললেন, 'সেদিন বলেছিলাম ভয় নেই, আমার কথা মিলল তো?'

সেজোমামী বললেন, 'মিলেছে। আচ্ছা মাসীমা একটা কথা বুঝতে পারছি না।'

'কি কথা?'

'যিনি আমার এত উপকার করছেন, তিনি কে?'

'একজন কড়া হেডমাষ্টার। ও বাড়িতে অনেক দিন ছিলেন। মরার পরও বাড়ি ছেড়ে যাননি। বড্ড ভালমানুষ। কিন্তু ছেলেদের বেয়াদপি, বজ্জাতি একদম সহ্য করতে পারেন না। পাজী ছেলেরা দু'দিন ওখানে থাকলেই টিট্ হয়ে যায়।'

এইসব ঘটনার বছরখানেক বাদে দেখা গেল, মামীর অসুখ-বিসুখ একদম সেরে গেছে। আর অ্যানুয়াল পরীক্ষায় আবু-টাবু-হাবু-পাবু, চার ভাই-ই ফার্স্ট হয়েছে।

রাজার আংটি ও জগাই

পহেলগাঁও-এর এই উঁচু-নিচু রাস্তাটার দুধারে লাইন দিয়ে হোটেল, টুরিস্ট লজ, আর নানা ধরনের দোকানপাট। দোকান-গুলোর ঝকঝকে কাচের আলমারিতে সাজান রয়েছে দারুণ দারুণ কাশ্মীরি শাল, পশমের টুপি, কোট, কাঠের আর পাথরের তৈরি কত রকমের যে জিনিস। দেখলেই সব কিনে ফেলতে ইচ্ছে করে।

বাঁ দিকের হোটেল-টোটেলের পেছন দিয়ে বয়ে গেছে লীডার নদী। তার নীল জল পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে একটানা ঝুমঝুম শব্দ করে যাচ্ছে। মনে হয় সারাদিন সারারাত নদীটা কথক নাচ নেচে চলেছে।

নদীর পর যতদূর চোখ যায় ছবির মত সাজান অগুনতি পাহাড়। পাহাড় শুধু নদীর দিকেই নেই ; সামনে পেছনে বা ডান দিকে—সব জায়গাতেই পাহাড় আর পাহাড়। তাদের গায়ে কত যে গাছ—

পাইন, দেবদারু, উইলো। এইসব গাছ আকাশের দিকে রাজার মত মাথা তুলে রয়েছে।

এখন বিকেল। সূর্যটাকে অবশ্য দেখা যাচ্ছে না; বাঁ দিকের পাহাড়গুলোর আড়ালে সেটা নেমে গেছে। শুধু উঁচু উঁচু গাছগুলোর মাথায় একটুখানি সোনালি রোদ চিকচিক করছে।

কিন্তু কাশ্মীরের এই উপত্যকায় ঐ রোদটুকুও আর বেশিক্ষণ থাকবে না। ঝুপ করে একটু পরেই সন্ধে নেমে যাবে; বিশেষ করে এই অক্টোবর মাসে।

বাতাস এর মধ্যেই ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কনকনে হিম উঠে আসছে চারপাশ থেকে। মাসখানেক পরেই যে কাশ্মীরে বরফ পড়তে শুরু করবে, এখনই তা টের পাওয়া যায়।

মা আর বাবার সঙ্গে পহেলগাঁও-এর রাস্তায় বেড়াচ্ছিল রুকু। ওদের তিনজনের পরনেই দামী দামী গরম পোশাক। মাথায় পশমের টুপি। পায়ে উলের মোজা, চকচকে জুতো।

রুকুদের পেছন পেছন হাঁটছিল জগাই। তার গায়ে খুব সস্তা দামের জামা-প্যাণ্ট আর রোঁয়াওলা মোটা উলের পুল-ওভার; পায়ে পুরোন কেডস। এতে কাশ্মীরের ঠাণ্ডা ঠেকান যায় না। ছেলেটা শীতে কাঁপছিল।

রুকু আর জগাই একবয়সী হবে; দুজনের এগার চলছে। লম্বায় দুজনেই সমান সমান।

রুকু কলকাতার একটা নাম-করা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়ে। খুব যত্নে থাকে বলে তার স্বাস্থ্য চমৎকার। গায়ের রঙ খুব ফর্সা, মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। তার কোন ভাইবোন নেই।

আর জগাই রোগা, কালো। সে-ও একসময় স্কুলে পড়ত; কিন্তু হঠাৎ মা-বাবা মরে যাওয়ায় দু' বছর আগে রুকুদের বাড়ি কাজ করতে এসেছিল। তারপর থেকে ওখানেই আছে। পৃথিবীতে তার আর

কেউ নেই। কাজ না করলে কে তাকে খাওয়াবে?

দিনরাত খেটেও রুকুদের বাড়ির কাউকে খুশি করতে পারে না জগাই। সারাক্ষণ সে বকুনি খায়। সব চাইতে বেশি বকাবকি করে রুকু। ছেলেটা যেমন রাগী, তেমনি হিংসুটে। একটুতেই ক্ষেপে উঠে চেঁচাতে থাকে। মা-বাবা আদর দিয়ে দিয়ে তাকে মাথায় তুলে ফেলেছে।

এইসব কারণে সবসময় মনমরা হয়ে থাকে জগাই। ওর দিকে তাকালেই বোঝা যায়, ছেলেটার বড় দুঃখ।

এই অক্টোবর মাসে কলকাতায় যখন মাইক বাজিয়ে, আলোয় আলোয় চারদিক ভরে দিয়ে পুজো হচ্ছে তখন রুকুরা যে হুম করে কাশ্মীর বেড়াতে এল তার পেছনে একটা দারুণ ঘটনা রয়েছে।

ঠিক চারমাস আগে, সেই জুনের শুরুতে সন্ধেবেলা রুকু মা-বাবার সঙ্গে লেকে বেড়াতে গিয়েছিল। ওদের সঙ্গে জগাইও ছিল।

কলকাতায় থাকলে রোজই বিকেলে দুঘণ্টা লেকে বেড়ায় রুকুরা। জগাইকেও ওদের সঙ্গে একটা বাস্কেট নিয়ে যেতে হয়। রুকুর বাবার কিছুক্ষণ পর পর কফি, রুকুর মায়ের চা আর রুকুর ওভালটিন খাওয়ার অভ্যেস। জগাইর বাস্কেটে তিনটে বড় ফ্লাস্ক আর তিনটে কাপ থাকে।

সেদিন সারা লেকটা একপাক ঘুরে ওরা যখন স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে লেক গার্ডেনসের দিকে যেতে যেতে বাঁধান ব্রিজটার ওপর এসে উঠেছে সেইসময় নিচের জলে ঝপাং করে একটা শব্দ হল। মনে হল কেউ পড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকের চিৎকার শোনা গেল। আর তক্ষুনি জলে আরেকবার ঝপাং শব্দ। জগাই বাস্কেটটা নামিয়ে রেখে তীরের মত ছুটে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সে খুব ভাল সাঁতার জানে।

লেকের এদিকটায় লোকজন বেশি ছিল না। আশপাশের রাস্তায় আলোগুলোও কেন যেন সেদিন জ্বলেনি; খুব সম্ভব খারাপ

হয়ে গিয়েছিল।

ব্রিজটার রেলিংয়ের ওপর দিয়ে অনেকখানি ঝুঁকে একটা অবাঙালী ফ্যামিলি দম বন্ধ করে তাকিয়ে ছিলেন। একজন মাঝবয়সী মহিলা সমানে কাঁদছিলেন। তাঁর পাশে যে বয়স্ক ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছিল, ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন। কী যে তিনি করবেন, ভেবে উঠতে পারছিলেন না।

রুকুরা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। কেন ওঁরা এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, কেন মহিলাটি কাঁদছেন আর কেনই বা বাস্কেট-টাস্কেট ফেলে জগাই ওভাবে ছুটে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, বোঝা যাচ্ছিল না।

রুকুর বাবা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বয়স্ক লোকটিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী হয়েছে বলুন তো? আমরা কি কোনভাবে সাহায্য করতে পারি?

ভদ্রলোক যা বলেছিলেন তা এইরকম। ওঁরা দিনকয়েক আগে কাশ্মীর থেকে কলকাতায় বেড়াতে এসেছেন। সেদিন এসেছিলেন লেকে। ঘুরতে ঘুরতে এই ব্রিজের ওপর আসতেই তাঁদের ছ'বছরের ছোট ছেলে হঠাৎ রেলিংয়ে উঠে কী যেন দেখতে গিয়ে পড়ে যায়। তারপরেই একটি ছেলে দৌড়ে এসে জলে লাফিয়ে পড়ে।

বোঝা গিয়েছিল, ছোট ছেলেটাকে পড়তে দেখে জগাই লেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সত্যিই তাই, একটু পরেই একটা বাচ্চাকে টানতে টানতে পাড়ে নিয়ে আসে সে। বাচ্চাটার তখন জ্ঞান নেই।

ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রলোক দৌড়ে গিয়ে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে ধরেন। ভদ্রলোক বলেন, এক্ষুনি একজন ডাক্তার দরকার। আমরা তো এখানকার কিছুই চিনি না—

—চিন্তা করবেন না, আমি ব্যবস্থা করছি।

রুকুর বাবা জগাই, রুকু এবং তার মাকে বাড়ি পাঠিয়ে তক্ষুনি ট্যাক্সি ডেকে ওঁদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার ভাল করে দেখে একটা ইঞ্জেকশান দিতেই ছেলেটা সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

এভাবে সাহায্য করার জন্য ভদ্রলোক রুকুর বাবার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। বলেছিলেন, আপনাদের জন্যে আমার ছেলেটিকে ফিরে পেলাম। এ উপকার কোনদিন ভুলব না।

রুকুর বাবা বলেছিলেন, আমি এমন কিছুই করিনি। যে কেউ এটুকু করত। আপনারা এখানে কোথায় উঠেছেন ?

একটা বিখ্যাত ফাইভ-স্টার হোটেলের নাম করেছিলেন ভদ্রলোক। রুকুর বাবা তাঁদের সেখানে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

হোটেলের দিকে যেতে যেতে ভদ্রলোকটির পরিচয় জেনে নিয়েছিলেন। তাঁর নাম আনোয়ার করিম। শ্রীনগরে তাঁদের বাড়ি। আপেল, আখরোট এবং বাদামের বাগান আছে পনেরটা। এছাড়া কাশ্মীরি সালের ব্যবসা আছে। আর বড় বড় হাউসবোট রয়েছে কুড়িটা ; সেগুলো ভাল লেকে ভাড়া খাটে।

বোঝা যাচ্ছিল, আনোয়ার সাহেব খুবই বড়লোক। তিনি রুকুর বাবার নাম-ঠিকানা ইত্যাদি জেনে নিয়েছিলেন।

হোটেলের কাছে পৌঁছে হঠাৎ আনোয়ার সাহেবের কী মনে পড়তে ভীষণ ব্যস্তভাবে বলেছিলেন, আরে, সেই ছেলেটিকে তো কিছুই বলে আসা হল না। বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে। ওর জন্যে আমার কিছু একটা করা উচিত ছিল—

—কার কথা বলছেন ?

—যে আমার ছেলে মকবুলকে জল থেকে তুলে এনেছে। ও না হলে মকবুলকে বাঁচানোই যেত না। ঐ ছেলেটি কে ?

চট করে কি ভেবে নিয়ে রুকুর বাবা বলেছিলেন, আমার ছেলে রুকু। ওর জন্যে কিচ্ছু করতে হবে না। কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করা তো একটা ডিউটি। খুব ছোটবেলা থেকে ওকে আমরা এই শিক্ষাই দিয়েছি।

—চমৎকার ছেলে আপনার। কাল বিকেলে আপনার বাড়ি গিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করে আসব।

—নিশ্চয়ই আসবেন।

পরের দিন আনোয়ার সাহেব প্রচুর মিষ্টি আর দামী দামী কেক নিয়ে রুকুদের লেক গার্ডেনসের বাড়ি এলেন। রুকুর সঙ্গে আলাপ করে তিনি খুব খুশি। তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে কতবার যে আশীর্বাদ করলেন। কাল আবছা অন্ধকারে কে তাঁর ছেলেকে লেকের জল থেকে তুলে এনেছিল বুঝতে পারেননি। তাছাড়া তখন তাঁর মনের যা অবস্থা অন্য দিকে তাকাবার মত সময় ছিল না।

আগের দিন হোটেলে আনোয়ার সাহেবদের পৌঁছে দিয়ে এসেই রুকুর বাবা রুকুকে শিখিয়ে রেখেছিলেন, জগাই না, সে-ই মকবুলকে জল থেকে তুলে এনেছে। এ নিয়ে আনোয়ার সাহেব যখন তাকে আদর টাদর করবেন তখন সে যেন আঙুল বাড়িয়ে জগাইকে দেখিয়ে না দেয়।

ওরা ইংরেজিতে কথা বলছিল। জগাই ইংরেজি না জানলেও কাল জল থেকে সেই ছোট ছেলেটাকে তুলে আনার ব্যাপারেই যে কথা হচ্ছিল, সেটা বুঝতে পেরেছে। আর এ জন্যই যে ঐ ভদ্রলোক রুকুকে আদর করছেন, তাও বোঝা যাচ্ছিল। দেখতে দেখতে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল জগাইর।

আনোয়ার সাহেব যে রুকুদের জন্য কী করবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছিল, অক্টোবর মাসে পুজোর ছুটিতে তাদের কাশ্মীরে নিয়ে যাবেন। পুরো ছুটিটা রুকুরা সেখানে কাটিয়ে আসবে। শ্রীনগরের সুন্দর সুন্দর হ্রদ, বাগান ইত্যাদি তো তারা দেখবেই। তাছাড়া সোনমার্গ, গুলমার্গ, চন্দনবাড়ি, তেজোয়াস বা পহেলগাঁওয়ে তাদের নিয়ে যাওয়া হবে। কাশ্মীরে যা যা দেখবার আছে সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবেন আনোয়ার সাহেব। শুধু তাই না, ডাল লেকে ক'দিন হাউসবোটেও থাকবে রুকুরা, ঝিলম নদীতে ট্রাউট মাছ ধরবে। ইচ্ছে হলে গুলমার্গে বরফের ওপর স্কীও করে আসবে।

কলকাতা থেকে কাশ্মীরে ফিরে জুলাই মাসের গোড়াতেই ভাড়ার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আনোয়ার সাহেব। রুকুর বাবা অনেক আগে আগেই ট্রেনের টিকিট কেটে রেখেছিলেন। জগাইকে একা বাড়িতে রেখে যাওয়া ঠিক নয়, তাই তার টিকিটও করা হয়েছে।

অক্টোবরে পুজোর ছুটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে রুকুরা কাশ্মীরে চলে এসেছে। প্রথমে শ্রীনগরে আনোয়ার সাহেবের বাড়িতে ক'দিন থেকে ওখানকার সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখেছে রুকুরা। তারপর আনোয়ার সাহেব শ্রীনগর থেকেই ফোনেই পহেলগাঁওয়ের এক হোটেলে একটা ভাল স্যুইট 'বুক' করে নিজের একখানা গাড়ি আর লোক দিয়ে রুকুদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। গাড়িটা রুকুদের কাছেই থাকবে, সঙ্গে যে লোকটাকে দিয়েছেন সে হবে ওদের ড্রাইভার এবং গাইড। তার নাম জামশিদ। চন্দনবাড়ির দিকে যতদূর যাওয়া যায় জামশিদ রুকুদের নিয়ে যাবে।

ব্যবসার কাজে আটকে যাওয়ায় আনোয়ার সাহেব রুকুদের সঙ্গে পহেলগাঁওয়ে আসতে পারেননি। সে জন্য রুকুর মা এবং বাবার কাছে বার বার ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন তিনি।

পরিষ্কার ঝকঝকে রাস্তা দিয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল রুকুরা। রাস্তায় এবং দু'ধারের দোকানগুলোতে প্রচুর লোকজন। এদের বেশির ভাগই টুরিস্ট। বাঙালী, শিখ, মারাঠী, গুজরাতি, রাজস্থানী—সারা ভারতের লোক তো এসেছেই, আমেরিকা ইওরোপ এবং ফার ইস্ট থেকেও অগুনতি টুরিস্ট এসেছে। প্রায় সবারই গলায় ঝুলছে একটা করে ক্যামেরা।

রাস্তাটা উটের পিঠের মত খানিকটা উঁচুতে উঠেই যেখানে ঢালের দিকে নেমে গেছে, সেখানে আসতেই ঘোড়াওলা গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, ইধর সাহাব, ইধর আইয়ে। বহোত আচ্ছা 'তেজ' ঘোড়া হ্যায় হামারা—

এখানে রাস্তার ধারে পাইনগাছগুলোর নিচে অনেকগুলো বেঁটে বেঁটে টাট্টু দাঁড়িয়ে আছে। জন্তুগুলোর পিঠে বসবার জন্য নরম গদি, আর গলায় দড়ি বাঁধা। দড়ির একটা মাথা তাদের মালিকরা ধরে রয়েছে।

সকাল-বিকেল ঘোড়াওলারা টুরিস্টদের ডাকাডাকি করে, তাদের টাট্টুগুলোর পিঠে তুলে দু-তিন ফার্লং ঘুরিয়ে আনে। এজন্য মোটামুটি ভালই পয়সা পায়। কার টাট্টু কত তেজী, কত ভাল দৌড়তে পারে, অনবরত তা চিৎকার করে করে জানাতে থাকে।

তিনদিন পহেলগাঁওয়ে এসেছে রুকুরা, তিনদিনই টাট্টুতে চড়েছে।

রুকু বলল, বাবা, ঘোড়ায় চড়ব।

রুকুর বাবারও সেই ইচ্ছাই ছিল। তিনটে ঘোড়া ভাড়া করে ফেললেন তিনি। একটা রুকুর জন্য, একটা তার মায়ের জন্য আর একটাতে তিনি চড়বেন।

জগাইর জন্য কোনদিনই টাট্টু নেওয়া হয় না। রুকুরা ঘোড়ায় চড়ে যতক্ষণ না ফিরে আসে, সে এই পাইনগাছগুলোর তলায় দাঁড়িয়ে থাকে। আজও দাঁড়িয়ে রইল।

রুকুদের তিনটে ঘোড়া পহেলগাঁওয়ের চকচকে রাস্তায় খট খট শব্দ তুলে একসময় দূরের বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রুকুদের পর এল আরো কয়েকজন টুরিস্ট, বার-চোদ্দটা টাট্টু ভাড়া করে সেগুলোর পিঠে চড়ে চলে গেল।

পাইনগাছের তলায় এখন আর বেশি ঘোড়া নেই। খুব বেশি হলে চার-পাঁচটা।

দূরে উঁচু গাছগুলোর মাথায় এখন আর রোদ নেই। সন্ধে নামতে শুরু করেছে। আবছা অন্ধকারে চারদিক ঢেকে যাচ্ছে। বাতাসে আরো বেশি করে হিমের গুঁড়ো মিশে গেছে। হিমের ছোঁয়ায় চামড়া যেন কেটে কেটে যাবে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল জগাইর মনে নেই। কার ডাকে চমকে
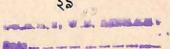
উঠে ডানপাশে তাকাতেই দেখতে পেল একটা ঘোড়াওলা তার টাট্টুটাকে নিয়ে খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

ঘোড়াওলা একজন যুবক, ভারি সুন্দর তার চেহারা।

এক ঘন্টার মত দাঁড়িয়ে আছে জগাই, তাছাড়া তিন-চার দিন ধরে রোজ এখানে আসছে। ঘোড়াওলাদের সবাই মুখচেনা হয়ে গেছে কিন্তু একে আগে আর কখনো দেখেছে বলে মনে হল না। জগাই একটু অবাকই হল।

চোখের ইশারায় অচেনা ঘোড়াওলা জগাইকে টাট্টুর পিঠে চড়তে বলল।

জগাই বেশ ভয়ই পেল। তারপর জামার পকেট দেখিয়ে জানালা তার পয়সা নেই।

ঘোড়াওলা ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বলল, না থাক পয়সা। রোজ তুমি এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাক। চল আজ তোমাকে একটু ঘুরিয়ে আনি।

হিন্দীটা ভালই বোঝে জগাই। কেন না কলকাতায় রুকুদের দোকান-বাজার সে-ই করে। ট্যাক্সিওলা রিক্সাওলা আইসক্রিম-ওলাদের তাকেই ডেকে আনতে হয়। ওদের সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলতে বলতে ভাষাটা মোটামুটি শিখে ফেলেছে সে।

জগাইর লোভও হল, আবার ভয়ও হল। ভয়ের কারণ রুকুরা এসে তাকে দেখতে না পেলে ভীষণ রেগে যাবে। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই ঘোড়াওলা তাকে টাট্টুতে চড়িয়ে দিল। জগাই না না করতে করতে নেমে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই টাট্টু সামনের দিকে ছুটতে শুরু করল।

এমনিতে টাট্টুরা আস্তে আস্তে দৌড়য়। কিন্তু জগাইর টাট্টু দারুণ জোরে ছুটছে। আগে কখনো ঘোড়ায় চড়েনি সে, ভয়ে টাট্টুর গলা জড়িয়ে ধরল সে। সেই অবস্থাতেই একবার পেছন ফিরে তাকাল, কিন্তু ঘোড়াওলাটাকে কোথাও দেখা গেল না, চোখের

পলকে সে উধাও হয়ে গেছে।

খানিকটা যাবার পর, আগে যে টাট্টু গুলো টুরিস্টদের নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল—তাদের দেখতে পেল জগাই। ওদের মধ্যে রুকুরা রয়েছে।

রুকুরাও ওকে দেখতে পেয়েছে। রুকুর বাবা চেঁচিয়ে বললেন, এই জগাই ঘোড়ায় উঠেছিস যে! এত বড় সাহস তোমার আমাদের না বলে টাট্টু তে চড়েছ! শিগ্‌গির নাম—বোঝা গেল, বাড়ির চাকর ঘোড়ায় চড়ায় তিনি ভীষণ রেগে গেছেন।

নামতে পারছি না—জগাই কথাটা শেষ করতে পারল না। তার আগেই তার টাট্টু দুরন্ত গতিতে রুকুদের ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গেল।

তারপর টাট্টুটা কখন যে ধবধবে সাদা কেশরওলা বিরাট এক আরবী ঘোড়া হয়ে গেছে, জগাই জানে না।

একসময় চাঁদ উঠল। দুধের মত জ্যোৎস্নায় চারদিক ভেসে যাচ্ছে।

হঠাৎ জগাইয়ের চোখে পড়ল, তার ঘোড়াটা রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটছে না, গাছপালা উপত্যকা আর লীডার নদীর ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে।

উড়তে উড়তে অনেকক্ষণ পর টুক করে নিচে নেমে একটা বিরাট বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। দেখেই বোঝা যায় এটা রাজার বাড়ি।

প্রকাণ্ড ফটকের সামনে বিরাট চেহারার দারোয়ানেরা কাঁধে খোলা তলোয়ার এবং বর্শা নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। ফটকের ভেতর দিকে তাকালে দেখা যাবে সেখানে প্রচুর আলো আর প্রচুর মানুষ।

ভয়ে বুক শুকিয়ে গিয়েছিল জগাইয়ের। এমন ভয় জীবনে সে আর কখনো পায়নি। পহেলগাঁওয়ের সেই টাট্টুটা যে বিরাট ধবধবে আরবী ঘোড়া হয়ে যাবে, তারপর হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে তাকে

এই রাজবাড়ির সামনে নিয়ে আসবে, কে ভাবতে পেরেছিল। এখান থেকে আর কি কোন দিন সে ফিরতে পারবে ?

কী করবে যখন জগাই বুঝে উঠতে পারছে না, সেই সময় কোত্থেকে যেন ক'টা লোক—তাদের মাথায় পাগড়ি, গায়ে দামী পোশাক—ছুটতে ছুটতে এসে জগাইকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে ভেতরের একটা ঘরে নিয়ে গেল।

এ বাড়িতে বিজলি বাতি নেই। চারদিকে শুধু ঝাড় লণ্ঠন, সেগুলোর ভেতর নানা রঙের মোম জ্বলছে।

লোকগুলো খুব যত্ন করে গরম জলে তার হাত-পা ধুইয়ে, বাজে জামা-প্যান্ট ছাড়িয়ে চমৎকার পোশাক পরিয়ে দিল। তারপর আরেকটা ঘরে এনে কত রকমের ভাল ভাল খাবার আর ফল যে খাওয়াল! এমন খাবার-দাবার জীবনে চোখেই দেখেনি জগাই।

ভয়টা অনেক কেটে এসেছিল জগাইর। সে একটা লোককে জিজ্ঞেস করল, এটা কার বাড়ি ?

লোকটা বলল, কাশ্মীরের রাজার।

—আমাকে এখানে আনা হল কেন ?

—রাজামশাই নিজেই তা বলবেন।

কাশ্মীরের রাজা কেউ আছেন কিনা, জগাই জানে না। কেন তিনি তাকে একটা বহুরূপী ঘোড়া পাঠিয়ে ধরে আনলেন তা-ই বা কে জানে। সেই ভয়টা আবার নতুন করে ফিরে এল। ভয়ে তার বুক গুরগুর করতে লাগল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। আরেক দল লোক এসে তাকে একটা প্রকাণ্ড হলঘরে নিয়ে এল। এখানকার জাঁকজমক দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেল জগাইর।

ঢুকবার মুখে যে বিরাট দরজাটা রয়েছে, সেখান থেকে পুরু লাল গালিচা একেবারে শেষ প্রান্তের উঁচু বেদী পর্যন্ত পাতা রয়েছে। দু'ধারে অনেকে বসে আছেন। এঁদের পোশাক, মাথার পাগড়ি, গলার

হার ইত্যাদি দেখে বোঝা যায়, এঁরা বিরাট বিরাট লোক।

গালিচার ওপর দু'পাশে হাতে রুপোর থালায় সাদা সুগন্ধি ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর সুন্দর মেয়েরা। একটি মেয়ে এসে তাকে দূরে বেদীর দিকে নিয়ে যেতে লাগল। সে যত এগুচ্ছে দু পাশের মেয়েরা তার মাথায় ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল।

জগাই জানে না এটা রাজ-দরবার। একসময় দরবারের শেষ মাথায় বেদীর কাছে পোঁছে যায় সে।

বেদীর ওপর সোনার সিংহাসনে যিনি বসে আছেন দেখামাত্র বোঝা যায় তিনিই রাজা। এই দরবারে যাঁরা এসেছেন তাঁদের সবার থেকে তিনি সুন্দর। সব চাইতে দামী পোশাক তাঁর পরনে, মাথায় যে মুকুটটা রয়েছে তাতে কত যে হীরেপান্না মণিমুক্তো! তাঁর পাশে আর একটা সিংহাসন ফাঁকা পড়ে আছে, সেটাও সোনার।

রাজা নিজে জগাইর হাত ধরে পাশের সিংহাসনে বসালেন। তারপর মিষ্টি করে হেসে তাকে বললেন, ঘোড়ায় চড়ে আসতে কষ্ট হয়নি?

মাথা নাড়ল জগাই—হয়নি।

—ভাল করে পেট ভরে খেয়েছ?

ঘাড় কাত করে জগাই জানাল, খেয়েছে। আস্তে আস্তে তার ভয় কাটতে লাগল।

রাজা এবার দরবারের দিকে ফিরে বলতে লাগলেন, আগে আপনাদের এই ছেলেটির পরিচয় দিই। এর নাম জগাই। বড় দুঃখী।

তারপর জগাই কোথায় থাকে, কী করে এবং কীভাবে মকবুলকে বাঁচিয়েছে এবং ওকে ঠকিয়ে কীভাবে ওর কৃতিত্ব রুকুর বাবা কায়দা করে নিজের ছেলেকে দিয়েছেন—সব জানিয়ে রাজা বলতে লাগলেন, এমন একটি ভাল ছেলে যে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে একজনকে বাঁচিয়েছে তার জন্যে আমাদের কিছু করা উচিত। কাশ্মীরে এসে মনে

দুঃখ নিয়ে জগাই ফিরে যাবে, এ হতে পারে না। আপনারা কী বলেন ?

সবাই মাথা নেড়ে জানালেন, নিশ্চয়ই কিছু করা উচিত।

রাজা বললেন, আমি জগাইকে কাশ্মীরের মানুষের তরফ থেকে ওর ভাল কাজের জন্য এই আংটিটা দিতে চাই। নিজের আঙুল থেকে একটা আংটি খুলে জগাইর দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

জগাই উঠে দাঁড়িয়ে আংটিটা নিয়ে রাজাকে প্রণাম করল। সে শুনেছে কেউ কিছু দিলে প্রণাম করতে হয়।

ওটা পরে ফেল।—রাজা বললেন,—এই আংটিটা যাদু আংটি। এর কাছে যা চাইবে তাই পাবে। তবে লোভ করে বেশি কিছু চাইবে না। তা হলে আংটিটা হারিয়ে যাবে।

হঠাৎ রুকুদের কথা মনে পড়ল জগাইর। আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, আমি যাদের কাছে থাকি তারা সব-সময় বকে, চোখ পাকিয়ে কথা বলে।

—মনে মনে আংটিটাকে ব'লো, দেখবে ওরা ভাল ব্যবহার করবে।

একটু সাহস করে জগাই এবার বলল, আমি যে মকবুলকে বাঁচিয়েছি, এই কথাটা আনোয়ার সাহেবকে ওরা জানাবে ?

—আংটিকে বললেই জানাবে।

—ছেলেবেলায় মা-বাবা মরে যাবার পর আর পড়তে পারিনি। আমার ইচ্ছে স্কুলে ভর্তি হব।

—আংটিকে জানালেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

একসময় রাজ-দরবারে জগাইর সংবর্ধনা শেষ হল। রাজা জগাইকে বললেন, যাও, এবার গিয়ে শুয়ে পড়। ঘোড়ায় চড়ে অনেকটা দূর থেকে আসছ। দেখে মনে হচ্ছে তুমি বড় ক্লান্ত।

জগাই বলল, আমি ফিরে যাব কি করে ?

—সে জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

রাজার ইশারায় দুটো লোক এসে জগাইকে একটা ঘরে নিয়ে

গেল। সেখানে বিরাট খাটে ধবধবে নরম বিছানায় গরম লেপের ভেতর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

পরের দিন যখন ঘুম ভাঙল, জগাই দেখল পহেলগাঁওয়ের সেই হোটেলের সামনের বাগানে বেতের চেয়ারে বসে আছে। আনোয়ার সাহেব এখানেই তাদের জন্য ঘর ভাড়া করেছেন। রোদে ঝলমল করছে চারদিক। আর তাকে ঘিরে রুকুরা তো দাঁড়িয়ে আছেই, হোটেলের লোকজনকেও দেখা যাচ্ছে। কাল সারারাত সে ফিরে না আসায় সবাই ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিল।

কিভাবে ঘুমের ঘোরে এখানে চলে এসেছে জগাই বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ কর্কশ গলায় রুকুর বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন, সমস্ত রাত কোথায় ছিলি রে পাজি বজ্জাত ছোকরা?

জগাই চমকে উঠলো। রুকুর বাবা, মা আর রুকু তার দিকে ভয়ঙ্কর চোখে তাকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে আংটির কথা মনে পড়ে গেল জগাইর। দেখল, ডান হাতের মাঝখানের আঙুলে রাজার দেওয়া আংটিটা রয়েছে। তবে ওরা যে দামী পোশাক পরিয়েছিল সেটা নেই। সে যা চায় মনে মনে আংটিটাকে জানাল।

তক্ষুনি মুখচোখের চেহারা একেবারে বদলে গেল রুকুদের। রুকুর মা আর বাবা কাছে এসে খুব নরম গলায় বললেন, সারা রাত তোর জন্যে ঘুমোতে পারিনি বাবা। কী দুশ্চিন্তায় যে কেটেছে! চল চল, ঘরে চল—

রুকু বলল, মা, ঠাণ্ডায় জগাইর বড্ড কষ্ট হচ্ছে। ওকে আমার কোট আর সোয়েটার দাও—

রুকুর মা বললেন, হ্যাঁ, এখন তোরটা পরুক। কলকাতায় গিয়ে ওকে নতুন কোট-টোট করিয়ে দেব।

এমন সুন্দর ব্যবহার রুকুদের কাছ থেকে আগে আর কখনো পায়নি জগাই।

এর দু'দিন বাদে শ্রীনগরে ফিরে রুকুর বাবা আনোয়ার সাহেবকে জানিয়ে দিলেন, তাঁর ছেলে রুকু নয়, কলকাতার লেক থেকে মকবুলকে বাঁচিয়েছে জগাই।

আরো দু-সপ্তাহ পর কলকাতায় ফিরে জগাইর পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিলেন রুকুর মা আর বাবা। এখন দুটো মাস সে বাড়িতেই পড়বে, জানুয়ারি পড়লেই তাকে ভাল স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হবে।

কাছে কেউ না থাকলে আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে জগাই। তখনই কাশ্মীরের রাজার মুখ মনে পড়ে। তাঁর কথা যতবার ভাবে, দু'চোখ জলে ভরে যায়।

হাতের কাজ

এখন যেটা বাংলাদেশ আটত্রিশ বছর আগে তাকে বলা হতো পূর্ব বাংলা। ভারতবর্ষ ভাগাভাগি হবার পর পূর্ব বাংলা হলো পূর্ব পাকিস্তান। তারপর এই সেদিন অনেক লড়াই করে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হলো। এখন তার নাম বাংলাদেশ। এ-সব ইতিহাস সকলেরই জানা।

আমি যে গল্পটা বলতে যাচ্ছি সেটা এখনকার বাংলাদেশের নয়, আটত্রিশ বছর আগের পূর্ব বাংলার।

পূর্ব বাংলা জলের দেশ। চারদিকে বিরাট বিরাট সব নদী—পদ্মা, মেঘনা, কালাবদর, ধলেশ্বরী, আড়িয়াল খাঁ, ইছামতী—এমনি কত যে, তার লেখাজোখা নেই। এ ছাড়া রয়েছে অগুনতি খাল বিল। নৌকো স্টিমার বা মোটর লঞ্চ ছাড়া কোথাও এক পা যাবার উপায় নেই।

সেবার আমাদের ছোট্ট শহর রাজদিয়া থেকে 'গয়নার নৌকো'য় উঠেছি। যাব তিনটে নদী পেরিয়ে অনেক দূরে নবাবগঞ্জ বলে একটা জায়গায়। ওখানে আমার মামার বাড়ি।

আমার বয়স তখন দশ-এগারো, ক্লাস ফাইভে পড়ি।

'গয়নার নৌকো' ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। ট্রেন যেমন নানা স্টেশনে থেমে কিছু প্যাসেঞ্জার তুলে, কিছু প্যাসেঞ্জার নামিয়ে চলতে থাকে, 'গয়নার নৌকো'ও অবিকল তা-ই। নদীর পাড়ে এক-একটা ঘাটে থামতে থামতে সেটা এগিয়ে যায়।

রাজদিয়া থেকে উঠেছিলাম সন্ধেবেলায়। সঙ্গে আমার মেজো কাকা। নবাবগঞ্জে পৌঁছতে পৌঁছতে পরের দিন দুপুর হয়ে যাবে। তার মানে সারাটা রাত আমাদের নৌকোতেই কাটাতে হবে।

আমরা যে 'গয়নার নৌকো'টায় উঠেছিলাম সেটা প্রকাণ্ড। মাঝি-মাল্লা ছাড়া একশ জন যাত্রীর তাতে জায়গা হয়ে যায়।

রাজদিয়ায় নৌকোটা ছাড়ার সময় খুব বেশি ভিড় টিড় ছিল না। সব মিলিয়ে কুড়ি-বাইশ জন প্যাসেঞ্জার।

তখন অঘ্রান মাস। আর কিছুদিনের মধ্যেই শীত পড়ে যাবে। খোলা নদীর ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল। 'গয়নার নৌকো'র এক কোণে গায়ে চাদর জড়িয়ে গুটিসুটি হয়ে বসে আছি। মাথার ওপর ছইয়ের সঙ্গে অনেকগুলো বড় বড় হ্যারিকেন বাঁধা রয়েছে। ভেতরে প্রচুর আলো।

মেজো কাকা খুব গম্ভীর মানুষ, রাজদিয়া হাই-স্কুলের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড মাস্টার। বাঘের মতো মেজাজ। তাঁর দাপটে গোটা স্কুল থরথর করে কাঁপতে থাকে। নৌকোয় উঠেই তিনি ব্যাগ খুলে একখানা মোটা বই খুলে বসেছিলেন। তার আগে শুধু একবার বলেছিলেন, কিরে, খিদে পেয়েছে ?

একটা গোটা রাত এবং পরের দিন দুপুর পর্যন্ত নৌকোয় থাকতে হবে। তাই বাড়ি থেকে প্রচুর খাবার-দাবার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু

সন্ধেবেলায় রাতের খাওয়া চুকিয়ে ফেলতে ইচ্ছা করছিল না।

বললাম, না।

খিদে পেলে বলিস।

আচ্ছা।

•

একসময় 'গয়নার নৌকো' ছেড়ে দিল। মাঝিরা তার আগেই পাল খাটিয়ে দিয়েছে। নৌকো নদীর ওপর দিয়ে বিশাল একটা জলপোকার মতো ভাসতে ভাসতে চলেছে।

সেটা ছিল পূর্ণিমার রাত। আকাশে রুপোর থালার মতো গোল একখানা চাঁদ উঠেছে। কিন্তু সেই অঘ্রান মাসে চারপাশে প্রচুর কুয়াশা, তাই জ্যোৎস্নাটা কেমন ঘোলাটে দেখাচ্ছিল।

ছইয়ের ভেতরে বসে থাকতে আমার একদম ভাল লাগছিল না। ইচ্ছা হচ্ছিল, বাইরে মাঝিদের কাছে গিয়ে চারপাশের দৃশ্য-টৃশ্য দেখব। ভয়ে ভয়ে সে কথা একবার মেজো কাকাকে বললামও কিন্তু বই থেকে মুখ তুলে চোখ কুঁচকে এমনভাবে তাকালেন যে ভীষণ দমে গেলাম। মেজো কাকা কড়া গলায় বললেন, ঠাণ্ডা লাগিয়ে অসুখ বাধাবার ইচ্ছে ?

কাজেই ছইয়ের ভেতর থেকে গলা বাড়িয়ে যেটুকু চোখে পড়ে, দেখে যাচ্ছিলাম। নদীটা খুব চওড়া। আমাদের নৌকো নদীর একটা পাড় ঘেঁষে যাচ্ছিল। এই পাড়ে মাঝে মাঝে ধানক্ষেত আর গাছগাছালির ফাঁকে আবছা আবছা দু-একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অন্য পাড়টা এত দূরে যে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ওদিকটা একেবারে ধু ধু। তবে সারা গায়ে কুয়াশা আর চাঁদের আলো মেখে আমাদের নৌকোর ওপর দিয়ে অনেক রাতজাগা পাখি উড়ে যাচ্ছিল। নদীতে ভুস ভুস করে কত যে শুশুক ভেসে উঠেই তক্ষুনি আবার জলের তলায় অদৃশ্য হচ্ছিল!

আকাশ, নদী, শুশুক, চাঁদের আলো, কুয়াশা—সব মিলিয়ে দারুণ

একখানা ছবি। সে সব দেখতে দেখতে চলেছি।

এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা পর পর আমাদের 'গয়নার নৌকো'টা এক-একটা ঘাটে এসে থামছে। কিছু যাত্রী তুলে, কয়েক জনকে নামিয়ে আবার দৌড় লাগাচ্ছে।

তু-তিনটে ঘাট পেরিয়ে যাবার পর মেজো কাকা হাতের বইটা বন্ধ করে বললেন, অনেক রাত হয়েছে। এবার খেয়ে নেওয়া যাক— কি বলিস?

এতক্ষণে বেশ খিদেও পেয়ে গিয়েছিল। মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

বাড়ি থেকে প্রচুর খাবার-দাবার সঙ্গে করে এনেছিলাম। লুচি, আলু-কপির তরকারি, বেগুনভাজা, ডিমের ডালনা আর চমচম।

আমরা একটা হোল্ড-অলে কম্বল বালিশ টালিশও নিয়ে এসেছিলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে মেজো কাকা বিছানা পাতছেন, আমি তাঁকে সাহায্য করছি—এই সময় 'গয়নার নৌকো'টা আরেকটা ঘাটে এসে থামল। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে প্রচুর লোকজন উঠে পড়ল। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, এরা ভীষণ গরীব। পরনে তালিমারা ধুতি বা লুঙ্গি আর বহুকালের ধুদ্ধুরে পুরনো নোংরা জামা। তার ওপর জ্যালজেলে পাতলা চাদর জড়ানো। কারো পায়েই জুতো-টুতো নেই। সবার গালেই খাপচা খাপচা দাড়ি, এলোমেলো চুল।

যে নৌকোয় একশ জন ধরে সেখানে এখন প্রায় দেড়শ লোক। মাঝিরা এবং অন্য যাত্রীরা তাদের অনেক করে বোঝালো, তোমরা কয়েকজন নেমে যাও, নইলে নৌকো ডুবে যাবে।

কে কার কথা শোনে! খানিকক্ষণ হৈচৈ চেঁচামেচি চলল কিন্তু কাউকেই নামানো গেল না। বাধ্য হয়েই শেষ পর্যন্ত মাঝিদের নৌকো ছেড়ে দিতে হল।

এদিকে আমরা যে তোফা একটা ঘুম লাগিয়ে নৌকোয় রাত কাটিয়ে দেব, তার আর উপায় রইল না। তাড়াতাড়ি বিছানা-টিছানা

গুটিয়ে আবার হোল্ড-অলে পুরে ফেলা হল।

ঘুমোতে তো পারবই না, একটু আরাম করে যে বসে যাব, তেমন জায়গাও নেই। গাদাগাদি ভিড়ে কোনরকমে হাত-পা বুকের ভেতর গুঁজে গুটিসুটি মেরে মেজো কাকা আর আমি বসে আছি। অন্য সবারও একই অবস্থা। কোথাও আধ ইঞ্চি ফাঁক নেই।

নতুন যে লোকগুলো উঠেছে, তারা নিজেদের মধ্যে কি সব পরামর্শ করছিল। কথা শুনে মনে হল, ওরা সব চাষী, নিজেদের জমি-টমি নেই, অন্যের জমিতে মজুরি নিয়ে কাজ করে। এখন তারা ধান কাটতে যাচ্ছে নবাবগঞ্জে, অর্থাৎ কিনা আমার মামাবাড়ির দেশে।

কিছুক্ষণ পর আরেকটা ঘাট এসে গেল। নৌকোটা ভিড়তে না ভিড়তেই হুলুস্থুল কাণ্ড। বোঝা যাচ্ছে, আরো নতুন লোক উঠছে।

'গয়নার নৌকো'টা আগাপাশতলা বোঝাই হয়ে আছে। এর ওপর একটা মাছি উঠলেও সবসুদ্ধু জলের তলায় চলে যেতে হবে।

কিন্তু যারা উঠল তাদের ঠেকানো যায় না। তারা হল একজন ছোট দারোগা, চার জন কনস্টেবল এবং একটি চোর।

ছোট দারোগার বিরাট মুখ, বিশাল গোঁফ আর প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। পরনে খাকির হাফ শার্ট আর হাঁটু পর্যন্ত খাকিরই হাফ প্যাণ্ট। তলার দিকে প্যাণ্টটার মস্ত ঘের, তার ফাঁক দিয়ে সরু সরু লিকলিকে দুটো পা নেমে এসেছে। কোমরে চামড়ার চওড়া বেল্ট আর পায়ে জবরদস্ত বুট।

ছোট দারোগাকে দেখে মনে মনে ফিক করে হেসে ফেললাম। ওই রকম রোগা রোগা পায়ের লোকটা তিন মণ ওজনের একটা শরীর বয়ে বেড়ায় কি করে?

ছোট দারোগার মতো অত বড় মাপের না হলেও চার কনস্টেবলেরও ভুঁড়ি এবং গোঁফের বাহার আছে। তাদের সবার কাঁধেই রাইফেল বাঁধা এবং গলায় টোটার মালা।

এদের মধ্যে সব চাইতে দর্শনীয় হল চোরটা। রোগা টিন্‌টিনে

ফড়িঙের মতো চেহারা। মাথায় খাড়া খাড়া চুল, গোল চোখ, চোখা থুতনি। লোকটার চোখ সারাক্ষণ চরকির মতো ঘুরছে।

চোরটার দু-হাতে লোহার হ্যাণ্ড কাফ, কোমরটা মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। সেই দড়ির একটা মাথা একজন কনস্টেবলের হাতে।

দারোগা-পুলিশ দেখে সবাই তটস্থ, কেউ টুঁ শব্দটি করছে না। নৌকো ডুবে তলিয়ে যাক, তবু তাদের নেমে যেতে বলার সাহস কারো নেই।

ছোট দারোগা এদিক সেদিক তাকিয়ে পছন্দমত একটু জায়গা খুঁজছিল, হঠাৎ মেজো কাকাকে দেখতে পেল সে। বেশ খুশি হয়েই বলল, 'মাস্টারমশাই যে—'

মেজো কাকা বললেন, 'আরে সমাদ্দার সাহেব, আপনি এখানে!'

'এসে বলছি।' বলেই যে সব চাষী-টাষীরা দম আটকে বসে ছিল তাদের দিকে ফিরে বাজখাঁই গলায় হুঙ্কার ছাড়ল ছোট দারোগা বা সমাদ্দার সাহেব, 'অ্যাই, তোরা সরে সরে বস্, যাবার জায়গা দে।'

চাষীরা নিজেদের শরীরগুলো কুঁকড়ে এই এ্যাত্তটুকু করে রাস্তা বানিয়ে দিল। ছোট দারোগা চোর এবং কনস্টেবলদের নিয়ে আমাদের কাছে চলে এল। তারপর সে নিজে বসল মেজো কাকার গা ঘেঁষে, চোর আর কনস্টেবলরা চাষীদের ভেতর জায়গা করে নিয়ে ঠাসাঠাসি করে বসল। চোরের কোমরের দড়িটা সেই কনস্টেবলটার হাতেই থেকে গেল।

ছোট দারোগা বলল, 'আপনার সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে যাবে, ভাবতে পারিনি। আপনার মতো পণ্ডিত লোকের দেখা পেয়ে বড় ভাল লাগছে। দিন রাত চোর-ছ্যাচড় ঘেঁটে ঘেঁটে মেজাজ খারাপ হয়ে থাকে। তা চললেন কোথায় মাস্টারমশাই?'

বুঝতে পারছিলাম ছোট দারোগার সঙ্গে মেজো কাকার জানা-শোনা আছে। আমাকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ওকে নিয়ে নবাবগঞ্জে ওর মামার বাড়ি যাচ্ছি।'

‘ছেলেটি কে ?’

‘আমার ভাই-পো।’

মামা বাড়ি কেন যাচ্ছি, এ নিয়ে ছোট দারোগা আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।

মেজো কাকা এবার হেসে হেসে বললেন, ‘এত রাত্তিরে এই বাহিনী নিয়ে চললেন কোথায় ?’

‘হবিবপুরে। যা একখান চাকরি জুটেছে তাতে রাতবিরেত বলে কিছু নেই, চব্বিশ ঘণ্টাই ডিউটি।’ একটু থেমে ফের বলল, ‘তিন বছর একটানা কাজ করছি। কাল ভেবেছিলাম মাসখানেকের ছুটি নিয়ে কোথাও একটু বিশ্রাম করব, কিন্তু ওই ব্যাটার জন্যে সব প্ল্যানের বারোটা বেজে গেল।’ বলে আঙুল বাড়িয়ে চোরটাকে দেখিয়ে দিল।

একটা চোর কীভাবে ছোট দারোগার ছুটি বানচাল করে দিল, বুঝতে না পেরে মেজো কাকা তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মেজো কাকার মনের কথাটা যেন ধরতে পারল ছোট দারোগা। বলল, ‘ওই ব্যাটা বিখ্যাত চোর। ওর নাম যুধিষ্ঠির।’

তার কথা শেষ হতে না হতেই হ্যাণ্ডকাফ-পরা হাত দুটো জোড় করে যুধিষ্ঠির বলল, ‘চোর ছিলাম ছোট সাহেব। এখন তো একরকম সাধুই হয়ে গেছি।’

জবরজং মোটা গোঁফে চাড়া দিয়ে সস্নেহে চোরটাকে দেখতে দেখতে মাথা নাড়ল ছোট দারোগা, ‘তা বটে, তা বটে। ব্যাটা একেবারে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরই বনে গেছে। কিন্তু মাস্টারমশাই, ওর লাইফ হিস্ট্রি যদি শোনেন আপনার মাথার ভেতর বাঁই বাঁই করে দশখানা নাগরদোলা ঘুরতে থাকবে।’

মেজো কাকার মজাও লাগছিল, আবার কৌতূহলও হচ্ছিল ভীষণ। বললেন, ‘কি রকম ?’

ছোট দারোগা এর পর যা বলে গেল তা এইরকম। ভূভারতে যুধিষ্ঠিরের মতো চোর নাকি আর একটাও জন্মায় নি। পদ্মা মেঘনা

ধলেশ্বরীতে যত স্টিমার, মোটর লঞ্চ আর 'গয়নার নৌকো' যায় তার যাত্রীদের রক্ষে নেই। যুধিষ্ঠির তাদের সব লোপাট করে দেয়।

কান খাড়া করে শুনে যাচ্ছিল যুধিষ্ঠির। সে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে, কাঁচমাচু মুখ করে ছোট দারোগার একটা ভুল শুধরে দিল, 'ওসব তিন বছর আগের কথা ছোট সাহেব। এখন তো আমি সাধুই হয়ে গেছি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ'—ঘাড়টা সামনে পেছনে নাচাতে নাচাতে ছোট দারোগা বলল, 'তিন বছর আগের কথাই এ সব। —তারপর শুনুন মাস্টারমশাই। যুধিষ্ঠির ব্যাটার হাতের কাজ ছিল দারুণ সূক্ষ্ম। আপনার সঙ্গে কথা বলছে কথা বলছে, হঠাৎ একসময় দেখলেন ও সামনে নেই। সেই সঙ্গে আপনার বোতাম আর ঘড়ি লোপাট হয়ে গেছে।'

শুনতে শুনতে আমার চোখ গোল হয়ে গিয়েছিল। মেজো কাকা সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন, 'বলেন কি সমাদ্দার সাহেব!'

'ঠিকই বলি মাস্টারমশাই। ব্যাটা একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজি-সিয়ান। ওর কাণ্ডকারখানা লিখলে বাইশখানা মহাভারত হয়ে যাবে।'

চোখেমুখে গর্ব গর্ব একটা ভাব ফুটিয়ে যুধিষ্ঠির তাকিয়ে ছিল। এবার সে বলল, 'সেই বউটার কথা এঁদের বলুন ছোট সাহেব।'

হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে, এমন একটা ভঙ্গি করে ছোট দারোগা বলতে লাগল, 'ব্যাটার হাতের কাজ যে কতটা ফাইন এই ব্যাপারটা থেকে বুঝতে পারবেন। সেবার মুন্সিগঞ্জের স্টিমারঘাটা থেকে গোয়া-লন্দের স্টিমার ছাড়বে ছাড়বে করছে। প্রায় সব প্যাসেঞ্জারই উঠে পড়েছে। শুধু একটি বউ বাকি। যে কাঠের পাটাতন দিয়ে প্যাসে-ঞ্জাররা জেটি থেকে স্টিমারে ওঠে, বউটা ছুটতে ছুটতে তার ওপর দিয়ে আসছিল। দু'পা গেলেই সে উঠতে পারবে কিন্তু তার আগেই স্টিমার ছেড়ে দেবার ঘন্টি বেজে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে জেটির খালাসিরা

পাটাতন ধরে দিয়েছে টান। বউটি হুড়মুড় করে জলেই পড়ে যেত। স্টিমারের ভেতরে গেটের কাছাকাছিই দাঁড়িয়ে ছিল যুধিষ্ঠির, হাত বাড়িয়ে তার একটা হাত ধরে এক টানে তাকে ভেতরে নিয়ে গেল। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে বউটি কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবে, ভেবে পেল না। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সে দেখল তার আঙুলের দুটো আংটি সুদ্ধ উধাও হয়ে গেছে যুধিষ্ঠির। তক্ষুনি যুধিষ্ঠিরের খোঁজে দলে দলে প্যাসেঞ্জাররা রে রে করে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু কোথাও তার পাত্তা মিলল না, একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সে।

খুশিতে এবং গর্বে যুধিষ্ঠিরের চোখ চক চক করছিল। সে বলল, 'একবার নরসিংপুরের জমিদারের টাকার ব্যাগ কেমন করে হাত সাফাই করেছিলাম, সেটা বলুন ছোট সাহেব।'

ছোট দারোগা দু-হাত তুলে, শরীরটা বেঁকিয়ে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর আঙুল ফোটাতে ফোটাতে হেসে হেসে বলল, 'আর পারি না রে ব্যাটা। তোর কীর্তিকলাপ বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে।'

মেজো কাকা সেই কথাটা ভোলেন নি। বললেন, 'যুধিষ্ঠিরের হাত-সাফাইয়ের অনেক গল্পই তো করলেন। কিন্তু ও কী ভাবে আপনাকে ছুটি নিতে দিল না সেটা কিন্তু বলেন নি।'

ছোট দারোগা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'আরে তাই তো, দাঁড়ান দাঁড়ান, বলছি। জানেন মাস্টারমশাই, যুধিষ্ঠির তো হাতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার টিকি ছোঁবার যো নেই। বজ্জাতটা একেবারে ইন্দ্রজাল জানে মশাই। এই হয়ত তাকে দেখা গেল, এই নেই। এদিকে তার নামে থানায় রোজ গণ্ডা গণ্ডা ডাইরি হচ্ছে। এস. পি. থেকে পুলিশের বড় বড় কর্তারা ওকে অ্যারেস্ট করার জন্য জীবন একেবারে অতিষ্ঠ করে ছাড়ছে। উল্লুকটার জন্যে মনে আর সুখ নেই।'

'তারপর?'

'তারপর ব্যাটার কপাল! একদিন ধরা পড়ে মাধবগঞ্জের
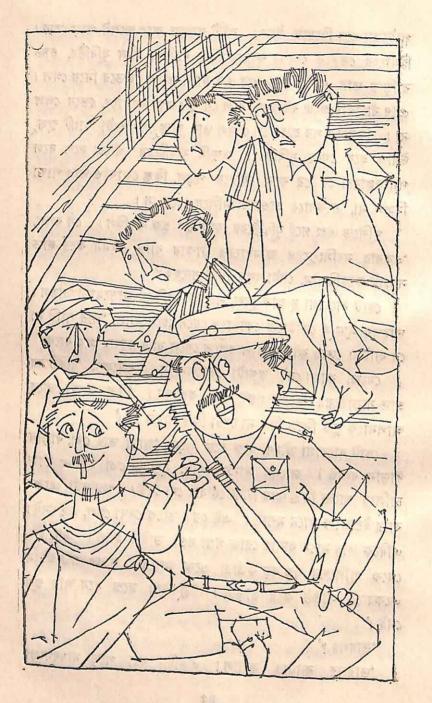
ডিষ্ট্রিক্ট জেলে চলে গেল। পাক্কা তিন বছরের জেল। এ অঞ্চলের লোকের হাড় জুড়লো মশাই।' ছোট দারোগা বলতে লাগল, 'কাল যখন ছুটির দরখাস্ত দিতে যাব তখন ও. সি. বললেন যুধিষ্ঠিরের জেল খাটার মেয়াদ শেষ হয়েছে। ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে। ও. সি.'র বাতের ব্যথাটা ভীষণ বেড়েছে। তাই আমাকে হাত ধরে বিশেষ করে রিকোয়েস্ট করলেন যাতে মাধবপুর থেকে যুধিষ্ঠিরকে হবিবপুরে নিয়ে যাই। ওখান থেকেই ওকে কিছু সই টই করিয়ে মুক্তি দেওয়া হবে। ওকে ও. সি.'র কাছে পৌঁছে দিলেই আমার কাজ শেষ। কাল থেকে আমি ছুটি পাব।'

এই সময় যুধিষ্ঠির বলে উঠল, 'তিন বছর আগের কথাই খালি বলে গেলেন ছোট সাহেব। মাঝখানের ব্যাপার-স্যাপার তো মাস্টারমশাইকে কিছুই জানালেন না।'

ছোট দারোগা নড়েচড়ে বসল। মাথা নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, 'আরে তাই তো, আসল কথাটাই বলা হয় নি। তিন বছর জেল খেটে ওই ঘাঘী জাঁহাবাজ যুধিষ্ঠির পুরোপুরি বদলে গেছে। কি রে, বদলাস নি?'

মাথাটা ডান দিকে দু' ফুট হেলিয়ে যুধিষ্ঠির বলল, 'তা আর বদলাই নি, পা থেকে মাথা পর্যন্ত একেবারে পাল্টে গেছি। আমার ভেতর একটা ভক্তি ভাব এসে গেছে, পাপ কাজে এখন বড্ড ঘেন্না লাগে।'

ছোট দারোগা বলল, 'মাধবপুর জেলের জেলারের কাছে শুনলাম, দিনরাত যুধিষ্ঠির নাকি আজকাল 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বা 'মা কালী মা কালী' করছে। ব্যাটা সত্যিকারের ধম্মপুত্তুর বনে গেছে। আখের কলে যেমন রসটুকু বার করে ছিবড়েটা ফেলে দেয়, তেমনি তিন বছর ঘানি ঘুরিয়ে ওর বডি থেকে সব খারাপ জিনিস বেরিয়ে গেছে।—না কি বলিস রে ব্যাটা?' বলে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকালো।

যুধিষ্ঠির তক্ষুনি সায় দিল, 'ঠিক বলেছেন ছোট সাহেব। জেলে

আমার সঙ্গে আর যে সব চোর ডাকাত খুনী ছ্যাচোড়রা ছিল তারা তো আমাকে মহাপুরুষ বলতে শুরু করেছিল।' বলতে বলতে বিনয়ে মাথা নুইয়ে, হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'আমি অবিশ্যি অতটা এখনও হই নি। তবে আপনাদের আশীর্বাদ পেলে—' এই পর্যন্ত বলে থেমে গেল।

ছোট দারোগা বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আশীর্বাদ না হয় দেওয়া যাবে। এখন একটা কথা মন খুলে বল্। জেল থেকে তো বেরিয়ে এলি, আগের মতো হাতের কাজ আবার শুরু করবি না কি?'

যুধিষ্ঠির শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি জিভ কেটে, কানে হাত দিয়ে বলল, 'আপনিই বললেন আমি ধম্মপুত্তুর হয়ে গেছি, আবার এখন এ কী বলছেন! যে সাধুমহাত্মা হয়ে হিমালয়ে চলে যাবে তার এ সব শোনাও পাপ।' বলতে বলতে মুখটা কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠল যুধিষ্ঠিরের।

ছোট দারোগা হাত তুলে বলল, 'আহা, কাঁদিস না ব্যাটা, কাঁদিস না। ঠাট্টাও বুঝিস না?'

প্রায় ফোঁপাতে ফোঁপাতেই যুধিষ্ঠির বলল, 'কবে ওসব করেছি, এখন কি আর তার কায়দা টায়দা মনে আছে? অভ্যেস না থাকলে সূক্ষ্ম হাতের কাজ করা যায়?'

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে যুধিষ্ঠিরকে শান্ত করল ছোট দারোগা।

এদিকে রাত আরো বেড়েছে। সবার চোখ বুজে আসছে। কথা বলতে বলতে ছোট দারোগার গলা জড়িয়ে এল। এক সময় বসে বসেই ঢুলতে লাগল সে, সঙ্গে সঙ্গে নাকের ডাক শুরু হয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যে নৌকোর একটা লোকও আর জেগে রইল না। চার কনস্টেবল, যুধিষ্ঠির এবং অন্য যাত্রীরা—সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। আর ঘুমের ঘোরে ঢুলে ঢুলে এ ওর ঘাড়ে পড়ছে।

ট্রেনে স্টিমারে বা নৌকোয় উঠলে সহজে আমার ঘুম আসে না। কিছুক্ষণ পর আমার চোখও জুড়ে আসতে লাগল। তার মধ্যে আবছা

আবছা দেখতে পেলাম, নৌকোয় যত লোক আছে তাদের মধ্যে সব চাইতে বেশি ঢুলছে যুধিষ্ঠির। ঢুলতে ঢুলতে তার চারপাশে যত চাষী টাষী রয়েছে সবার ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ছে। তাদের সঙ্গে ওর মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে যাচ্ছে।

ভোর রাত্তিরে, তখনও বেশ অন্ধকার আছে, যুধিষ্ঠির এবং কনস্টেবলদের নিয়ে হবিবপুরে নেমে গেল ছোট দারোগা। 'গয়নার নৌকো'র যাত্রীদের কারো ঘুম ভাঙে নি তখন পর্যন্ত। সবাই জড়াজড়ি করে ঢুলছে।

আরো দু-ঘন্টা পর কুয়াশা আর অন্ধকার কেটে গেল। ঝলমলে সোনালী রোদে চারদিক ভেসে যেতে লাগল। এই সময় 'গয়নার নৌকো'টা পেয়ারাতলির ঘাটে এসে ভিড়ল। এর পর চার পাঁচ ঘন্টা কোথাও আর না থেমে দুপুরবেলা সোজা নবাবগঞ্জে গিয়ে ভিড়বে। তার মানে যাদের সঙ্গে খাবার-দাবার নেই, পেয়ারতলি থেকে কিছু চিড়ে মুড়ি-টুড়ি কিনে না নিলে দুপুর পর্যন্ত তাদের উপোস দিয়ে থাকতে হবে।

আমাদের সঙ্গে লুচি মিষ্টি-টিষ্টি আছে। কিন্তু যে চাষীরা নবাবগঞ্জে ধান কাটতে যাচ্ছে তাদের কয়েকজন মুড়িটুড়ি কিনবার জন্য জামার পকেট বা লুঙ্গির কষি থেকে পয়সা বার করতে গিয়ে লাফিয়ে উঠল। তারপরই একসঙ্গে তারস্বরে মড়াকান্না জুড়ে দিল।

হঠাৎ কী হল, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। লোকগুলোকে থামানোও যাচ্ছে না। মেজো কাকা সমানে বলতে লাগলেন, 'কী হয়েছে তোমাদের, কী হয়েছে?'

অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর চাষীরা জানালো, বাড়ি থেকে বেরুবার সময় রাস্তায় খরচের জন্য পাঁচ সাতটা করে টাকা সঙ্গে এনেছিল, কিন্তু সেই টাকা পাওয়া যাচ্ছে না—সব চুরি হয়ে গেছে। এখন তারা কী করবে?

মেজো কাকা তাদের সবাইকে দুটো করে টাকা দিয়ে বললেন,

'যাও, কিছু কিনে টিনে আনো।'

এদিকে আমার মাথার ভেতর বন বন করে একটা চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। মনে পড়ছে, যাদের টাকা চুরি হয়েছে তাদের মধ্যেই কাল রাত্তিরে গাদাগাদি করে বসে ছিল যুধিষ্ঠির। ঘুমের ঘোরে আমার চোখে পড়ছিল, ঢুলতে ঢুলতে সে ওদের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ছে। তখন বুঝতে পারি নি, যুধিষ্ঠির কী করছে।

হাতে হ্যাণ্ডকাফ, কোমরে দড়ি, চারপাশে দারোগা-পুলিশের পাহারা—এর মধ্যেই যুধিষ্ঠির বুঝিয়ে দিয়েছে সে কত বড় ম্যাজিসিয়ান। তিন বছর জেলের ঘানি ঘুরিয়ে যখন তার ভেতর থেকে সব খারাপ জিনিস বেরিয়ে গেছে, যখন সে সাধু মহারাজ হতে যাচ্ছে, সেই সময় সূক্ষ্ম একটি হাতের কাজ দেখিয়ে আমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়ে গেছে যুধিষ্ঠির।

বুবুনের বাঘ আর পাঁচ ডাকাত
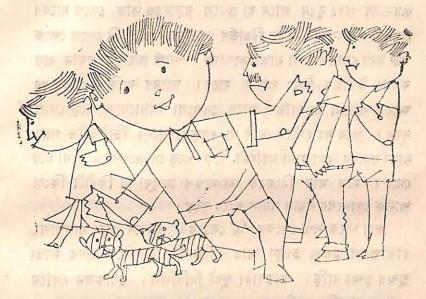
ডাকাত ধরতে হলে ছবি আঁকতে পারা চাই, এমন কথা কেউ কি কখনও শুনেছ! যত উদ্ভটই হোক, ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি। পাঁচ পাঁচটা ব্যাঙ্ক ডাকাত কী করে ধরা পড়ল সে কথা বলার আগে বুবুন আর তার ছবি আঁকার কথাটা বলে নেওয়া যাক।

বুবুনের বয়স ঠিক ন' বছর দু মাস। হাইট চার ফুট দশ ইঞ্চি। নাকমুখ খুব ধারালো। ঝকঝকে চোখ দুটোতে বুদ্ধি আর দুষ্টুমি মেশানো। মাথাভর্তি ঘন চুল, সেগুলো মাঝে মাঝেই চোখের ওপর ঝামড়ে এসে পড়ে।

লেখাপড়ায় দারুণ ভাল বুবুন। এ বছর ফার্স্ট হয়ে ক্লাস ফাইভে উঠেছে। এবারই না, সেই ওয়ান থেকেই ফার্স্ট হয়ে আসছে।

শুধু পড়াশোনায় না, খেলাধুলাতেও বুবুন দারুণ। স্কুলের অ্যানুয়েল স্পোর্টসে পাঁচ ছ'টা কাপ মেডেল পাবেই। তা ছাড়া ক্লাসের

ফুটবল আর ক্রিকেট টীমের ক্যাপ্টেনও সে-ই।

স্কুলের পড়া সে যেমন মন দিয়ে করে থাকে, অন্য নানা ধরনের বইও পড়ে। অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ড মানে জন্তু-জানোয়ারদের সম্বন্ধে এমন সব খবর বুবুন জানে যা শুনলে বড়দেরও তাক লেগে যাবে। সোবার্স গাভাসকার লয়েড রিচার্ডস মারাদোনা প্লাতিনি পেলে থেকে শুরু করে কোনোর্স বা নাভ্রাতিলোভা সম্পর্কে তাকে যে কোন প্রশ্ন করলে টকাটক উত্তর পাওয়া যাবে। তাদের বাড়িতে ছোটদের অনেক সায়েন্স ম্যাগাজিন আসে, সেগুলো আগাগোড়া পড়ে ফেলে বুবুন। তবে সব চাইতে বেশি যা পড়ে তা হলো ডিটেকটিভ গল্প। নানা ধরনের গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে পড়ে সে একেবারে ঝুনো হয়ে গেছে। মনে মনে নিজেকে ব্যোমকেশ ফেলুদা বা কিরীটী কিংবা শার্লক হোমসের সমান সমান ভাবে বুবুন।

ওরা থাকে সল্ট লেকের 'এ' সেক্টরে। এখানে প্রচুর গাছপালা, রাস্তাগুলো চওড়া চওড়া আর পরিষ্কার। চারদিকে ছবির মতো সুন্দর সুন্দর বাড়ি। জায়গাটা খুবই নিরিবিলি। লোকজন এখানে কম। সারাদিন পাখির ডাক শোনা যায়।

বুবুনদের বাংলো ধরনের দোতলা বাড়িটা ওদের পাড়ার সব বাড়ির থেকে সুন্দর। সামনের দিকে চমৎকার ফুলের বাগান, পেছন দিকে অনেক ঝাউ আর ইউকালিপ্টাস গাছ।

বুবুনের বাবা নাম-করা হার্টের ডাক্তার, মা একটা কলেজে ইংরেজি পড়ান।

বুবুনের বাবা সকালের খাবার খেয়ে হাসপাতালে যান, সেখান থেকে নার্সিং হোমে, তারপর ধর্মতলা স্ট্রীটে তাঁর চেম্বারে। মা দশটায় কলেজে যান। বাবা বাড়ি ফেরেন রাত্তিরে, মা বিকেলে। মা বাবা বেরুবার আগেই বুবুন খুব সকালে স্কুলে চলে যায়। তার মর্নিং স্কুল। গরম কালে সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে এগারটা, শীতের সময় সাতটা থেকে বারোটা। ছুটির পর একটা ড্রাইভার তাকে বাড়ি নিয়ে

আসে। ওদের সবসুদ্ধু তিনখানা গাড়ি।

দুপুরবেলাটা বুবুন বাড়িতে একেবারে একা। তার আর কোন ভাইবোন নেই। তবে কাজের লোক আছে পাঁচ ছ'জন। এরা ছাড়া আরো কয়েকজন আছে। দুটো বিরাট বিরাট বুলডগ, একটা বাঁদর, চারটে বেড়াল, দেয়ালজোড়া অ্যাকুয়েরিয়ামে লাল নীল মাছ এবং কয়েক ডজন মুনিয়া পাখি। তারের জাল দিয়ে ঘিরে তাদের জন্য ঘর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা সুন্দর শিংওলা হরিণও তাদের ছিল, দু বছর আগে সেটা মরে গেছে।

ফাইভে উঠবার পর বুবুনের ঝোঁক চাপল, ছবি আঁকা শিখবে। মা বি-ডি মার্কেটের কাছে যে ছবি আঁকার নতুন স্কুলটা খুলেছে, সেখানে তাকে ভর্তি করে দিলেন। স্কুলটার নাম 'কিশলয়'। প্রতি রবিবার সকালে ওখানে ক্লাস হয়।

ছবি আঁকার জন্য রং, তুলি, স্কেচ পেন আর গোছা গোছা পেন্সিল কিনে দিলেন মা।

বুবুনের যখন যেটা মাথায় চাপে তাই নিয়ে মেতে থাকে। স্কুলের পাঁচ ঘণ্টা আর বাড়িতে পড়ার জন্য ঘণ্টা তিনেক বাদ দিয়ে বাকি সময়টা সে ছবি এঁকে যেতে লাগল।

প্রথম প্রথম কাগজেই আঁকছিল সে, পরে তার নজর পড়ল ডিসটেম্পার-করা ধবধবে দেওয়ালগুলোর দিকে। একদিন দুপুরবেলা মা-বাবার ঘরের দেয়াল জুড়ে মনের সুখে ফুল লতাপাতা বেড়াল কুকুর পাখি ইত্যাদি এঁকে ফেলল। দেয়ালের নিচের দিকটায় তুলি চালাতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু ওপর দিকটায় হাত যায়নি বলে টেবিলের মাথায় চেয়ার বসিয়ে তাতে চড়ে নিতে হয়েছে।

দেয়ালে আঁকার আইডিয়াটা বুবুনের মাথায় এসেছে বাবার বন্ধু অনুপম কাকুর বাড়িতে গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে। অনুপম কাকু তাঁদের বসবার ঘরের দেয়ালে আর্টিস্টদের দিয়ে তাক-লাগানো

সব ছবি আঁকিয়েছেন। জিজ্ঞেস করে বুবুন জেনে নিয়েছিল, দেয়ালের এই ছবিগুলোকে মুরাল বলে।

বুবুন ভেবেছিল, তার মুরাল দেখে মা-বাবা খুব খুশি হবেন। বরং তার উল্টোটাই হলো। বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে মা দেয়ালের হাল দেখে খুবই বকাবকি করলেন। রাত্তিরে বাবা ফিরেও রীতিমত ধমক-ধামক দিলেন।

'দেয়ালটার এভাবে সর্বনাশ করলে?'

ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল বুবুনের। বলল, 'বা রে, অনুপম কাকুর বাড়িতে মুরাল দেখে কত ভাল বললে, আমার বেলায় যত রাগ।'

বাবা বললেন, 'ঐ রকম ছবি আঁকতে শেখো, তখন সবাই ভাল বলবে। তার আগে দেয়ালের কাছে একদম যাবে না।'

পরের দিনই বাবা রঙের মিস্তিরি ডাকিয়ে ঘষে ঘষে বুবুনের সব ছবি তুলিয়ে দেয়ালটা ফের আগের মতো ডিসটেম্পার করিয়ে নিলেন।

ক'দিন বাদে দুপুরবেলা বুবুনের মাথায় হঠাৎ নতুন একটা আইডিয়া এল। অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ডের পাতা খুলে অদ্ভুত অদ্ভুত জন্তুর ছবি বার করে বাড়ির বেড়ালগুলোকে ধরে রং টং দিয়ে অবিকল তাদের মতো সাজাতে লাগল। ফলে সাদা বেড়ালটা হয়ে গেল টকটকে লাল। ছাই রঙেরটা হলো সবুজ। কালচে রঙেরটা ক্যাটকেটে নীল। আর যেটা ঘোর কালো, তার গায়ে ইচ্ছেমতো হলদে দাগ টেনে দিল। শুধু তাই না, তুলো আর পাটের দড়ি দিয়ে কোনটার লেজ আরো দেড় ফুট লম্বা করে দিল। কোনটার মুখে এঁটে দিল লম্বা মুখোশ।

বাড়ির পোষা পশুপাখিগুলো বুবুনের খুবই বাধ্য। তারা একটুও আপত্তি করল না। তাদের চোখমুখ দেখে মনে হলো, রংচং মেখে নতুনভাবে সাজতে পেরে তারা ভীষণ খুশি হয়েছে। বুবুনও খুব খুশি।

বেড়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে এখন আর চেনাই যায় না। মনে

হয় আমাজন কি মিসিসিপি নদীর পাড়ের জঙ্গল থেকে উদ্ভট চেহারার সব জন্তু সন্ট লেকে বেড়াতে এসেছে।

বেড়ালগুলোর চেহারা বদলে দিয়ে ভাল লাগছিল ঠিকই, তবে সবাইকে না দেখাতে পারলে পুরোপুরি মজা জমছে না। হঠাৎ বুবুন ঠিক করে ফেলল, বেড়ালদের নিয়ে রাস্তায় বেড়াতে যাবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। সেগুলোর গলায় সরু চেন বেঁধে যখন সে নিচে নামিয়ে নিয়ে এল তখন গেটের দারোয়ান রামসুখ ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে হাতের তোলাতে খৈনি ডলছিল। আচমকা বুবুনের সঙ্গে অদ্ভুত ক'টা জন্তু দেখে, ভয় পেয়ে টুল থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। কোনরকমে সামলে নিয়ে বলল, 'এগুলো কী জানবর (জানোয়ার) খোঁখাবাবু ?'

বুবুন বলল, 'আফ্রিকার ভোঁদড়।'

'আগে তো দেখিনি।'

'কাল রাত্তিরে বাবা নিয়ে এসেছেন।'

কথাটা ঠিক বিশ্বাস হলো না দারোয়ানের। সন্দেহের চোখে বেড়ালগুলোকে দেখতে দেখতে বলল, 'হামি তো গেটে বসে ছিলাম। লেকেন আঁখে তো পড়ল না।'

বুবুন বলল, 'বাবা বড় বাক্সে করে এনেছেন। যাই, এদের হাওয়া খাইয়ে আনি।' বলে গেটের বাইরে চলে গেল। দুপুরে রাস্তায় একটু হাঁটাহাঁটির জন্য মা-বাবার পারমিশান নেওয়া আছে।

পেছন থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দারোয়ান বলল, 'বেশি দূরে যেও না, জলদি জলদি ফিরে এসো।'

'আচ্ছা—'

এই সময়টা রাস্তা একরকম ফাঁকাই থাকে। মোড়ের মাথায় একদিকে সাইকেল রিকশার স্ট্যাণ্ড, তার উল্টোদিকে একটা ব্যাঙ্ক। ওখানে অবশ্য বেশ লোকজন চোখে পড়ে। রিকশাওলারা এবং ব্যাঙ্কের লোকেরা সবাই বুবুনকে চেনে।
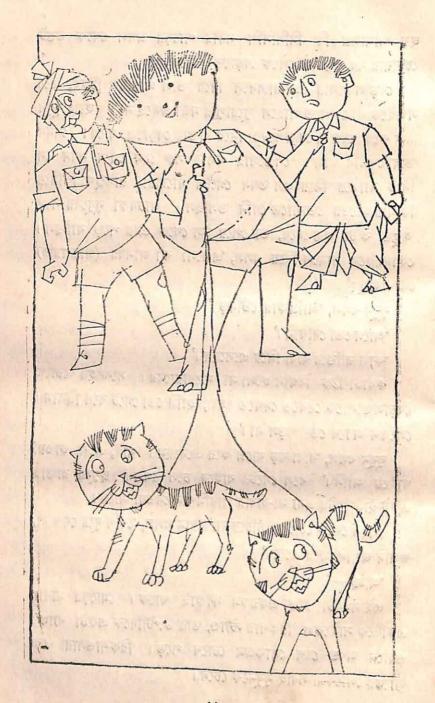
রাস্তায় যে দু-চারজন রয়েছে, অবাক হয়ে তারা বুবুনের সঙ্গী চারটে অদ্ভুত জন্তুকে দেখতে লাগল।

মোড়ের মাথায় আসতেই রিকশাওলা আর ব্যাঙ্কের লোকজনেরা খানিকক্ষণ হাঁ হয়ে রইল। তারপর বলল, 'এমন জন্তু তো আগে কখনও দেখিনি। এদের কোথায় পেলে?'

দারোয়ান রামসুখকে যা বলেছিল, এদেরও ঠিক তাই বলল বুবুন। অর্থাৎ জন্তুগুলো হলো আফ্রিকার ভোঁদর। বাবা এগুলো উগাণ্ডা থেকে আনিয়েছেন। আফ্রিকার ভোঁদড় সম্পর্কে ব্যাঙ্কের লোকজন এবং রিকশাওলাদের নানারকম কৌতূহল মিটিয়ে কিছুক্ষণ পর বাড়ি ফিরে এল বুবুন।

বিকেলে মা এবং রাত্তিরে বাবা বাড়ি ফিরে কতকগুলো বিদঘুটে চেহারার জন্তুকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে চমকে উঠলেন। তারপর ভাল করে লক্ষ্য করতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বুবুনকে ডাকিয়ে এনে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'বেড়ালগুলোর এই অবস্থা করল কে? নিশ্চয়ই তুমি?'

ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বুবুন বলল, 'ভাবলাম ওদের একটু সাজিয়ে দিই।' একটু থেমে বলল, 'ওদেরও সাজতে ইচ্ছে করে। মুখে তো বলতে পারে না, তাই—'

'পশুদের মনস্তত্ত্ব জেনে ফেলেছ দেখছি।' বাবা রেগে উঠতে গিয়ে হেসে ফেললেন, 'তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।'

বুবুন চুপ করে রইলো।

বাবা আবার বললেন, 'যত পারো বেড়াল-টেড়ালের গায়ে রং লাগিয়ে হাত পাকাও! তবে দেখো ওগুলো যেন মরে টরে না যায়।'

এরপর বুবুনের চোখ পড়ল পাখিগুলোর ওপর। সেগুলোর গায়ে মনের সুখে রং মাখিয়ে, কারো মাথায় ফেভিকল দিয়ে অদ্ভুত ঝুঁটি জুড়ে, তুলো দিয়ে কারো লেজ বড করে ফেলতে লাগল সে। তারপর তাদের পায়ে সুতো বেঁধে দুপুরে রাস্তায় ঘুরিয়ে আনল। ব্যাঙ্কের

লোকজনেরা বা রিকশাওলারা জিজ্ঞেস করলে বুবুন বলল, 'এটা কঙ্গোর কোকিল', 'ওটা ব্রাজিলের শালিখ', 'সেটা সাহারা মরুভূমির চড়ুই—'

পাখি বেড়াল এবং বাঁদরের পর আজ বুবুনের নজর পড়ল বুলডগ দুটোর ওপর। বাবা ওদের দু'জনের নাম দিয়েছিল—ডম্বল আর কম্বল।

কুকুর দুটো শুধু কথা বলতে পারে না, নইলে ওদের হাবভাব সব মানুষের মতো। কেউ কিছু বললে বা চোখের ইশারা করলে ঠিক বুঝতে পারে।

ডম্বল কম্বলের মেজাজ সাঙ্ঘাতিক। বাড়িতে নতুন অচেনা লোকের হুট করে ঢোকার উপায় নেই। তাদের পেছনে একেবারে বাঘের মতো তাড়া করে যাবে। কিন্তু বাড়ির লোকের কাছে, বিশেষ করে বুবুনের কাছে তারা একেবারে 'শান্ত শিষ্ট লেজ বিশিষ্ট'। বুবুন সাতটা চড় মারুক, কান মুলে দিক, চিমটি কাটুক—ওরা গলা দিয়ে একটু আওয়াজও বার করবে না; শুধু বেঁটে বেঁটে লেজ দুটো ঘন ঘন নাড়তে থাকবে।

এ ক'দিন যখন বুবুন পাখি আর বেড়ালদের গায়ে রং টং মাখাচ্ছিল তখন ডম্বল কম্বল কাছে এসে বসে থাকত আর সমানে কুঁই কুঁই করে শব্দ করত। ওরা বলতে চাইত, 'আমাদেরও সাজিয়ে দাও।'

বুবুন বলত, 'হবে হবে। একটু সবুর কর। তোদের এমন করে সাজাব, যে দেখবে তার মুণ্ডু ঘুরে যাবে!'

অনেকদিন আশায় আশায় থাকার পর আজ ডম্বল কম্বলের সাজার পালা। সকালে স্কুলে যাবার সময়ই বুবুন সে কথা ওদের জানিয়ে গেছে। ছুটির পর বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি স্নান-খাওয়া সেরে ডম্বল কম্বলকে নিয়ে নিজের পড়ার ঘরে চলে এল সে।

এই ঘরটায় শুধু তার বইপত্তরই থাকে না, রং, তুলি, স্কেচ পেন, ফুটবল, ক্রিকেট ব্যাট, উইকেট, প্যাড, খেলার বুট, কেডস, সাইকেল—

এমনি হাজার রকমের জিনিসও থাকে।

ডম্বল কম্বলের কান ধরে নাড়তে নাড়তে বুবুন বলল, 'তোদের কী সাজাই বল তো?'

ডম্বল কম্বল কুঁই কুঁই করে জানালো, 'তোমার যা ইচ্ছে—'

অনেকক্ষণ চোখ-টোখ কুঁচকে, ঠোঁট টিপে কি ভাবল বুবুন। তারপর বইয়ের র‍্যাক থেকে 'অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ড'টা নামিয়ে এনে পাতা ওলটাতে ওলটাতে একটা ছবি দেখে থেমে গেল। ছবিটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের।

বাঘের ছবি দেখতে দেখতে বুবুনের চোখ ঝিকমিকিয়ে উঠল। মাথাটা একটু কাত করে ডম্বল কম্বলের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে হেসে হেসে বলল, 'তোদের আজ রয়েল বেঙ্গল টাইগার সাজাব।'

আধ ঘণ্টার ভেতর ডম্বল কম্বলের চেহারা একেবারে বদলে গেল। সারা গায়ে হলদে রঙের ওপর কালো কালো ডোরা আঁকা হয়েছে। মোটা মোটা পাটের দড়ি জোড়ার ফলে বেঁটে লেজ দুটো চার হাত লম্বা হয়ে গেছে।

এপাশ থেকে, ওপাশ থেকে এবং পেছন থেকে তাদের দেখতে দেখতে বুবুন বলল, 'সব ঠিক হয়েছে কিন্তু তোদের মুখ দুটো বিচ্ছিরি। ও দুটোকে কী করে বাঘের মুখ বানাই বল তো—' বলতে বলতে হঠাৎ কিছু মনে পড়তে খুশিতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'দাঁড়া দাঁড়া, তার ব্যবস্থা করে ফেলছি।' বলেই ঘরের কোণে যে কাচের আলমারিটা রয়েছে সেদিকে ছুটে গেল।

ক'দিন আগে মা বুবুনের জন্য ক'টা মুখোশ কিনে এনেছিলেন। তার মধ্যে তিনটে বাঘের মুখোশও রয়েছে। সেগুলো আলমারিতে রেখে দিয়েছিল সে।

দুটো মুখোশ বার করে এনে ডম্বল কম্বলের মুখে পরিয়ে গলায় সুতো বেঁধে দিল বুবুন। এইবার ওদের ঠিক রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতো দেখাচ্ছে।

সাজগোজ শেষ হয়েছে। বুবুন বলল, 'চল, তোদের একটু ঘুরিয়ে আনি।'

নিচে গেটের কাছে আসতে দারোয়ান একটুক্ষণ কুকুর দুটোকে লক্ষ্য করে হেসে ফেলল। মাথা নেড়ে নেড়ে বলল, 'ওরা জরুর হামাদের ডম্বলিয়া কম্বলিয়া। খোঁখাবাবু ওদের বাঘ বানিয়েছে।'

প্রথম দিন দারোয়ানটা চমকে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু খোঁখাবাবু মানে বুবুন যে বাড়ির পশুপাখিগুলোর গায়ে রং-টং করে চেহারা বদলে দিচ্ছে, তার এই খেলাটা পরে ধরে ফেলেছে।

একটু হেসে ডম্বল কম্বলকে নিয়ে বাইরের রাস্তায় চলে গেল বুবুন।

অন্যদিন রাস্তার লোকেরা বুবুনের সঙ্গে অদ্ভুত অদ্ভুত চেহারার জন্তু এবং পাখি-টাখি দেখে হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছে। কিন্তু সল্ট লেকের রাস্তায় হঠাৎ জোড়া বাঘ দেখে তারা পড়ি মরি করে ছুটতে লাগল। যারা উল্টোদিক থেকে আসছিল, থমকে দাঁড়িয়েই পেছন ফিরে দৌড় লাগাল।

দারুণ মজা লাগছিল বুবুনের। ডম্বল কম্বলের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'তোদের দেখে ভয় পেয়ে লোকগুলো কেমন ছুটছে, দেখছিস!'

কুঁই কুঁই করে ডম্বল কম্বল জানালো—দেখেছে। লোকজনের ছোটাছুটিতে তাদেরও খুব মজা লাগছে।

হাঁটতে হাঁটতে মোড়ের মাথায় এসে বেশ অবাকই হলো বুবুন। বাঁ দিকের ফুটপাথ ঘেঁষে অন্যদিন গাদা গাদা সাইকেল রিকশা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আজ একটা রিকশাও দেখা যাচ্ছে না। চারদিক ফাঁকা আর কেমন যেন থমথমে।

এবার বুবুন ওধারে তিনতলা বড় বাড়িটার দিকে তাকাল। ওটার নিচের তলায় ব্যাঙ্ক।

ব্যাঙ্কে এই সময়টা বেশ ভিড় থাকে। আজ লোকজন তেমন

দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ বুবুনের চোখে পড়ল, ব্যাঙ্কের সামনে একটা নীল রঙের মোটর। সেটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা লোক। তার পরনে জীনস, পায়ে কেডস, চোখে কালো গগলস। লোকটার এক হাতে সিগারেট, অন্য হাতে রিভলবার। সে ছাড়া আরো একজন লোক ব্যাঙ্কের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পোশাকও অনেকটা এক ধরনের, তবে চোখে গগলস নেই। তার হাতেও রিভলবার।

দু'জনেরই ভাবভঙ্গি যেন কেমন। চনমন করে তারা চারদিকে তাকাচ্ছে।

কয়েক শো ডিটেকটিভ গল্প মাথার ভেতর গিসগিস করছে বুবুনের। তা ছাড়া খবরের কাগজে প্রায় রোজই একটা না একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির খবর বেরোয়। সব মিলিয়ে বুবুনের মাথার ভেতর দ্রুত কমপিউটারের মতো কাজ চলতে লাগল। তার মনে হলো, এই লোকগুলো ভাল না ; নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কে ডাকাতি করতে এসেছে।

বেশ ভয় পেয়ে গেল বুবুন। কী করবে যখন সে বুঝে উঠতে পারছে না সেই সময় নীল গাড়ির গায়ে হেলান-দেওয়া লোকটা ডম্বল কম্বলকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে তার চুল খাড়া হয়ে উঠল ; চোখ দুটো একেবারে গোল হয়ে গেল। 'বাবা রে, গেছি রে—' বলে চিৎকার করেই চোঁ চাঁ দৌড়ে ডান দিকের রাস্তা দিয়ে উধাও হয়ে গেল। হাত থেকে রিভলবারটা কখন যে ছিটকে গাড়িটার কাছে পড়ে গেছে, তার খেয়ালই নেই।

গগলস-পরা লোকটার চিৎকারে দরজার কাছের লোকটা এধারে তাকিয়েই চমকে উঠল। সে-ও ডম্বল কম্বলকে দেখতে পেয়েছে। 'মরে গেলাম, মরে গেলাম--' করে চেঁচাতে চেঁচাতে রিভলবার টিভলবার ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল।

এতক্ষণে ভয়টা অনেকখানি কেটে গেছে বুবুনের। ডম্বলের

পিঠে আঙ্গুলের খোঁচা দিয়ে বলল, 'ধর ওকে, ধর—'

বলামাত্র গর্জন করতে করতে বন্দুকের গুলির মতো ডাকাতটার পেছনে ধাওয়া করে গেল ডম্বল। কম্বলকে নিয়ে সাইকেল রিকশার স্ট্যাণ্ডটার কাছে দাঁড়িয়ে রইল বুবুন।

লোকটা সোজাসুজি সামনের রাস্তায় প্রাণপণে ছুটছে কিন্তু ডম্বলের সঙ্গে পারবে কেন? ডম্বল যখন তাকে প্রায় ধরে ফেলেছে, সেই সময় লাফ দিয়ে একটা ল্যাম্প-পোস্ট বেয়ে তর তর করে ওপরে উঠে গেল।

বুবুন দূর থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'ডম্বল তুই ওখানে বসে থাক। ব্যাটা নামলেই ঘাড় মটকে দিবি।'

ডম্বল ল্যাম্প-পোস্টের তলায় বসে ডাকাতটাকে পাহারা দিতে লাগল।

ঠিক এই সময় ব্যাঙ্কের ভেতর থেকে আরো তিন ডাকাত বেরিয়ে এল। একজনের কাঁধে বিরাট একটা চটের থলে। বোঝাই যায় থলেটা টাকায় বোঝাই। তার দু'পাশের দু'জনের হাতে রিভলবার। বোঝা যায়, এরা তিনজনও ব্যাঙ্ক ডাকাত। টাকা লুট করে বেরিয়ে এসেছে।

ডানদিকের লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে এধারে ওধারে তাকিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, 'এই ছোনে, এই আজিজ—' কাউকে দেখতে না পেয়ে তার মুখ রাগে কুঁচকে গেল।

বুবুন বুঝতে পারছে, বাইরে যারা রিভলবার হাতে পাহারা দিচ্ছিল, এই তিনজন তাদের খুঁজছে।

বাঁ দিকের লোকটা বলল, 'জাহান্নামে যাক ওরা। এখানে বেশিক্ষণ থাকলে বিপদে পড়তে হবে। চল—চল—'

ওরা যখন নীল মোটরটার দিকে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে সেই সময় ডান পাশের লোকটা কম্বলকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে 'উরি বাবা' বলে দৌড়ে যেই গাড়ির ভেতর ঢুকতে যাবে, বুবুন বলল,

'কম্বল, ওদের গাড়িতে ঢুকতে দিবি না। গো—কুইক—'

বিদ্যুৎগতিতে কম্বল রাস্তা পেরিয়ে গেল!

তিন ডাকাতের গাড়িতে করে পালানো সম্ভব হলো না। 'মেরে ফেলল, বাঁচাও বাঁচাও—' বলে চিৎকার করতে করতে তারা আগের দু'জনের মতো ছুটতে লাগল। তাদের পেছনে কম্বল আর বুবুনও ছুটছে।

একটা ডাকাত মাইল খানেক দৌড়বার পর হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। পড়েই অজ্ঞান। বাকি দুটো প্রাণের ভয়ে রাস্তার ধারের একটা বিরাট গাছে উঠে পড়ল। কোথায় পড়ে রইল তাদের রিভলবার আর টাকার বস্তা! গাছটার তলায় কম্বল পাহারা দিতে লাগল। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে রইল বুবুন।

রাস্তায় কেউ নেই। যারা ছিল, তিনটে লোকের পেছনে একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে তাড়া করতে দেখে পলকে উধাও হয়ে গেছে। রাস্তায় না থাকলেও দুধারের সব বাড়ির ছাদে এবং জানলায় অনেক মুখ দেখা যাচ্ছে। তারা সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে, 'পালিয়ে যাও খোকা, পালিয়ে যাও—' বুবুনের জন্য ভয়ে আতঙ্কে তাদের দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

এ জায়গাটা বুবুনদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে। এখানে তাকে কেউ চেনে না। গাছের মাথার ঐ লোক দুটো আর কম্বলের ব্যাপার তারা কিছুই জানে না। বুবুন চিৎকার করে বলল, 'আপনারা সবাই বেরিয়ে আসুন। কোন ভয় নেই। গাছে যারা উঠেছে তারা খুবই খারাপ লোক। ওদের পুলিশে দিতে হবে।'

বুবুন ভরসা দেওয়া সত্ত্বেও কেউ বাইরে এল না। বরং বার বার তাকে পালাতে বলল।

বুবুন বলল, 'তা হলে এক কাজ করুন, থানায় ফোন করে দিন। এক্ষুণি যেন পুলিশ চলে আসে।'

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল একটা বিরাট কালো ভ্যান বোঝাই

হয়ে পুলিশ এসে পড়ল। যে ফোন করেছিল সে হয়ত বাঘের কথা জানিয়েছে। ভ্যানের পুলিশরা বন্দুক তুলে কম্বলের দিকে তাক করল। এমন ভয়ঙ্কর জন্তুকে বাইরে ছেড়ে রাখা যায় না।

কম্বলকে ওরা হয়ত মেরেই ফেলত, তার আগেই চিৎকার করে উঠল বুবুন, 'প্লীজ ওকে মারবেন না, মারবেন না। ও বাঘ নয়—'

ভ্যানটার সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে একজন পুলিশ অফিসার বসেছিলেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'বাঘ নয় তো কী?'

'আমাদের কুকুর কম্বল—'

সন্দেহের চোখে কম্বলকে দেখতে লাগলেন পুলিশ অফিসার।

বুবুন বলল, 'বিশ্বাস না হয়, নেমে আসুন। আমি আপনাকে সব দেখাচ্ছি।'

অফিসার ভাবলেন, একটা ছোট ছেলে যখন বাঘটাকে ভয় পাচ্ছে না তখন নিশ্চয়ই কোন ব্যাপার আছে। আস্তে আস্তে তিনি ভ্যান থেকে নামলেন। বুবুন তাকে নিয়ে কম্বলের কাছে চলে এল। একটানে তার মুখোশ খুলে দিতেই বুলডগের মুখ বেরিয়ে পড়ল। বাড়তি লেজটাও টেনে খুলে ফেলল বুবুন। তবে কম্বলের গায়ে হলদে রঙের ওপর কালো কালো ডোরাগুলো থেকেই গেল।

পুলিশ অফিসার ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, বললেন, 'এ কি! বুলডগটাকে বাঘ সাজালে কে?'

বুবুন বলল, 'আমি।' সে আরো জানালো তাদের বাড়ির পোষা পশুপাখিগুলোর গায়ে রং-টং করে তাদের চেহারা বদলে দেয় সে।

পুলিশ অফিসার এবার খুব রেগে গেলেন, 'এভাবে বাঘ সাজিয়ে তুমি লোকজনকে ভয় দেখাচ্ছ! এক্ষুণি থানায় নিয়ে তোমার বাঁদরামি ছুটিয়ে দিচ্ছি। ওঠ ভ্যানে—'

বুবুন বলল, 'আমাকে থানায় নেবার আগে ওদের ধরুন—' বলে গাছের মাথায় সেই লোকদুটোকে দেখিয়ে দিল।

'ওরা কারা?'

'ব্যাঙ্ক ডাকাত।'

অফিসার খানিকক্ষণ হাঁ হয়ে রইলেন। কিছুই তাঁর মাথায় ঢুকছে না। একসময় বললেন, 'এর মানে কী? কোন ব্যাঙ্কে ওরা ডাকাতি করেছে? গাছে উঠল কি করে?'

খুব তাড়াতাড়ি সমস্ত ঘটনা বলে গেল বুবুন।

এদিকে পুলিশের দলটা ভ্যান থেকে নেমে এসেছিল। অফিসার তাদের বললেন, 'যাও, চটপট গাছে উঠে দুই বদমাশকে ধরে আনো।'

পাঁচ ছ'টা পুলিশ তক্ষুণি গাছের মাথা থেকে দুই ডাকাতকে নামিয়ে আনলো। তাদের হাতে হ্যাণ্ড-কাফ লাগিয়ে তক্ষুণি ভ্যানে পুরে ফেলা হলো।

বুবুন বলল, 'আরো দুটো ডাকাত আছে।'

দারুণ ব্যস্তভাবে পুলিশ অফিসার বললেন, 'কোথায়, কোথায়?'

'আসুন আমার সঙ্গে।'

রাস্তায় যে ঘাড় গুঁজে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, এবার তাকে তুলে ভ্যানে তোলা হলো। তারপর বুবুন সবাইকে নিয়ে এল সেই ল্যাম্প-পোস্টটার তলায় যেটার মাথায় একটা ডাকাত চড়ে বসে আছে আর নিচে পাহারা দিচ্ছে ডম্বল। তাকেও নামানো হলো।

রাস্তায় ডাকাতদের রিভলবারগুলো এবং টাকার থলেটাও পাওয়া গেল।

বুবুন বলল, 'পাঁচটা ডাকাত ছিল। একটা পালিয়ে গেছে।'

অফিসার বললেন, 'কোন চিন্তা নেই। চারটে যখন ধরা পড়েছে তখন ওটাকেও ঠিক ধরে ফেলবো। এখন যে ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছে সেখানে নিয়ে চল।'

বুবুন তাদের পাড়ার সেই ব্যাঙ্কটায় পুলিশ অফিসারদের নিয়ে এল।

ডাকাতরা ব্যাঙ্কের লোকজনকে দড়ি বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে একটা ঘরে ঢুকিয়ে, বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়েছিল। পুলিশ

তাদের বাঁধন-টাধন খুলে মুক্ত করল। তারপর কিভাবে কখন ব্যাঙ্কে ডাকাতিটা হলো, এসব খবর টুকে নিয়ে, ক'জন পুলিশকে ব্যাঙ্কের সামনে পাহারায় রেখে বাকি পুলিশদের নিয়ে ভ্যানে উঠলেন। বুবুন এবং ডম্বল কম্বলকেও সঙ্গে নিলেন।

থানার দিকে যেতে যেতে বুবুনের কাঁধে একটা হাত রেখে পুলিশ অফিসার বললেন, 'ব্রেভো বয়, তোমার মতো বাহাদুর ছেলে আর দেখিনি। তুমি আর তোমার দুই রয়াল বেঙ্গল যা কাণ্ড করলে!' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল, 'আরে তোমার নামটাই তো জানা হয়নি।'

বুবুন নাম বলল।

'তোমার বাবার নাম?'

'ডাক্তার শরদিন্দু সেন—'

'তুমি ডাক্তার সেনের ছেলে! ঐ ব্যাঙ্কটার কাছেই তোমাদের বাড়ি—তাই না? তোমার মা তো প্রফেসর।'

দেখা গেল, বুবুনের মা-বাবাকে অফিসার চেনেন। বুবুন মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

থানায় এসেই অফিসার বুবুনের মা-বাবাকে ফোন করলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে দু'জনে চলে এলেন। তাঁদের চোখেমুখে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা। বুবুন কী করে বসেছে কে জানে। তারপর পুলিশ অফিসারের কাছে পুরো ঘটনা শুনে তাঁদের ভয় কাটল কিন্তু দু'জনের কেউ খুশি হলেন না।

বাবা বেশ রাগের গলায় বললেন, 'ছবি আঁকতে শিখে এই কীর্তি করে বেড়াচ্ছ! যথেষ্ট হয়েছে; এখন এসব বন্ধ কর। আর তোমাকে আঁকার স্কুলে যেতে হবে না।'

বাবার ধমক-টমক খেয়ে চোখে জল এসে গেল বুবুনের। মুখ নীচু করে সে বসে রইল।

পুলিশ অফিসার বুবুনের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে ব্যস্তভাবে

বাবাকে বললেন, 'ওকে বকবেন না ডাক্তার সেন। ভাগ্যিস বুবুন ছবি আঁকতে শিখেছিল, তাই না ঐ বজ্জাত ডাকাতগুলো ধরা পড়ল।'

'কিন্তু কত বড় বিপদের ঝুঁকি ছিল বলুন তো। ডাকাতগুলো যদি গুলি-টুলি ছুঁড়ত!'

'বিপদের ঝুঁকি না থাকলে কি বড় কাজ করা যায়!'

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর বুবুন এবং ডম্বল কম্বলকে নিয়ে মা-বাবা বাড়ি ফিরে গেলেন।

দিন চারেক পর পুলিশ অফিসার বুবুনদের বাড়ি এসে একটা দারুন সুখবর দিয়ে গেলেন। অদ্ভুত উপায়ে ডাকাত ধরে দেবার জন্য পুলিশ থেকে বুবুনকে সোনার মেডেল দেওয়া হবে আর ব্যাঙ্ক দেবে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার।

রাজার খেলা

ধর্মতলায় নিধু জ্যাঠার সঙ্গে ট্রাম থেকে নেমে কার্জন পার্কের ভেতর দিয়ে ইডেন গার্ডেনের দিকে যেতে যেতে একেবারে হাঁ হয়ে গেল রাজা। চারপাশ থেকে যত বাস মিনিবাস ট্রাম ট্যাক্সি আর প্রাইভেট কার আসছে, সব মানুষে ঠাসা। গাড়িগুলো এসে থামছে কার্জন পার্কে, রাজভবনের গায়ে এবং ওধারের ময়দানে। সেগুলো থেকে গল গল করে মানুষ বেরিয়ে এসে সোজা চলেছে ইডেন গার্ডেনের দিকে। আজ গোটা কলকাতা যাচ্ছে রঞ্জি স্টেডিয়ামে ইণ্ডিয়া ভার্সাস ইংল্যাণ্ডের টেস্ট ম্যাচ দেখতে।

কার্জন পার্ক থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। অগুনতি গাড়ি সামনে দিয়ে দারুণ স্পীডে রেড রোডের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ট্রাফিক কনট্রোলে লাল আলো জ্বলতেই

ছুটন্ত গাড়িগুলো থেমে গেল। আর নিধু জ্যাঠার হাত ধরে, রাস্তা পেরিয়ে রাজভবনের ফুটপাথে চলে এল রাজা। তারপর মানুষের স্রোতে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলল।

নিধু জ্যাঠার বয়স সত্তরের কাছাকাছি। সাধারণ বাঙালিদের তুলনায় সে অনেক লম্বা, প্রায় ছ ফুটের মতো। টান টান চেহারা, শরীরে এক গ্রাম বাজে চর্বি নেই। মাথার প্রায় সব চুল সাদা হয়ে গেছে, তবু নিধু জ্যাঠা খুব স্মার্ট। তার হাঁটার ভঙ্গি যুবকদের মতো।

এই মুহূর্তে নিধু জ্যাঠার পরনে মালকোচা দিয়ে পরা ধুতি আর ফুল শার্ট, তার ওপর রোঁয়াওলা উলের সোয়েটার। পায়ে কেডস। কাঁধ থেকে একটা কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে।

তার পাশে রাজাকে বেশ ছোট দেখাচ্ছে। রাজার পরনে এখন ফুল প্যান্ট আর বুশ শার্ট, তার ওপর লাল পুল-ওভার। পায়ে নীল মোজা আর বুট।

রাজভবনের ফুটপাথটা সেমি সার্কেলে ঘুরে গেছে। সেটা ধরে খানিকটা যেতেই চোখে পড়ল, ওধারের ময়দানে কয়েক হাজার প্রাইভেট কার পার্ক করা রয়েছে। তার মানে গাড়িওলারা ওখানে গাড়ি রেখে স্টেডিয়ামে ঢুকেছে। খেলা ভাঙলে ফিরে এসে যে যার গাড়িতে উঠে চলে যাবে।

নিধু জ্যাঠার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দারুণ ভাল লাগছিল রাজার, ভীষণ উত্তেজনাও হচ্ছিল। তার কারণ, এই প্রথম সে ইডেন গার্ডেনে টেস্ট ম্যাচ দেখতে যাচ্ছে।

রাজারা থাকে উত্তর কলকাতায়—বাগবাজারের কাছে একটা সরু গলিতে। সে পড়ে মডেল স্কুলে, ক্লাস সিক্সে। আজ একত্রিশে ডিসেম্বর। এ বছরেরই অক্টোবরে সে এগার পেরিয়ে বারোয় পা দিয়েছে।

পড়শোনায় রাজা বেশ ভাল। প্রতি বছর ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে আসছে। লেখাপড়ার মতো খেলাধুলোতেও তার খুব ঝোঁক। কিন্তু

নর্থ ক্যালকাটায় খেলার মাঠ নেই। কখনও সখনও কোনো পার্কে একটু জায়গা পেলে পাড়ার ছেলেদের জুটিয়ে টেনিস বল দিয়ে ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল কি ইণ্ডিয়া-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ম্যাচের আসর বসিয়ে দ্যায়। নইলে খবরের কাগজের খেলার পাতা আর ঝকমকানো রঙিন সব স্পোর্টস ম্যাগাজিন পড়ে কখনও সে স্বপ্ন ছ্যাখে পেলের মতো ফুটবল খেলোয়াড় হবে, কখনও বা ভাবে ভিভ রিচার্ডসের মতো ব্যাটসম্যান না হলে চলবে না।

এই খেলাধুলোর ব্যাপারটায় সারাক্ষণ রাজাকে তাতিয়ে রাখে নিধু জ্যাঠা। এই যে আজ জীবনে প্রথম ইডেনে টেস্ট ম্যাচ দেখতে যাচ্ছে সেটাও নিধু জ্যাঠার জন্মই।

রাজার বাবারও খেলাটেলায় যথেষ্ট আগ্রহ। তিনি মোটামুটি একটা চাকরি করেন। এদিকে ফ্যামিলিতে লোকজন অনেক। রাজারা চার ভাইবোন, বাবা, মা, ঠাকুমা আর এক বিধবা পিসিমা। মোট আটজন। এত বড় সংসার চালাতে অফিস ছুটির পরও বাবা আরো কী সব করেন। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রোজই তাঁর রাত হয়। অনেক কষ্টে টায়টোয় কোনোরকমে রাজাদের চলে যায়।

বাবার পক্ষে পঁচাত্তর টাকা দিয়ে টেস্ট ম্যাচের টিকিট কেটে দেওয়া সম্ভব না। দামী দামী খেলার ম্যাগাজিনও তিনি কিনে দিতে পারেন না। বাড়িতে একটাই মোটে বাংলা খবরের কাগজ আসে। নিধু জ্যাঠাই এর ওর কাছ থেকে অন্য সব খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন চেয়ে এনে রাজাকে দেয়। পড়া হয়ে গেলে সেগুলো ফেরত দিয়ে আসে।

টেস্ট খেলা তো আজ বললে কাল হয় না। ছ'মাস কি তারও আগে ঠিক করা থাকে। এবার ইডেনে ইণ্ডিয়া ইংল্যাণ্ডের টেস্ট দেখার জন্য রাজা আর নিধু জ্যাঠা সবাইকে লুকিয়ে পয়সা জমাতে শুরু করেছিল। ছ'জনের টিকিটের দাম দেড়'শ টাকা। টেস্টের তারিখটা জানার পর থেকেই টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে একটা ফাঁকা

পাউডারের কৌটোয় রাখছিল রাজা। এইভাবে পঁচিশ টাকা জমানো গেছে। বাকি একশ পঁচিশ টাকা দিয়ে দু'খানা টিকিট কিনে আনে নিধু জ্যাঠা।

নিধু জ্যাঠা রাজার আপন জ্যাঠা নয়। এমন কি তার সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্কই নেই। না থাক, তবু আপনজনের চেয়ে সে অনেক বেশি।

রাজা শুনেছে, দেশভাগের আগে ঢাকা শহরে বাবারা যে পাড়ায় থাকতেন নিধু জ্যাঠাও সেখানেই থাকত। বাবার থেকে কয়েক বছরের বড়; সেই হিসেবে সে বাবার দাদা, রাজাদের জ্যাঠা।

নিধু জ্যাঠার পোশাকী নাম প্রিয়নাথ নাগ, ডাকনাম নিধু। ভাল নামটা লোকে ভুলেই গেছে। নিধুটাই সবার মুখে মুখে চালু রয়েছে।

নিধু জ্যাঠার তিন কুলে কেউ নেই, বিয়েও করেনি। রাজা শুনেছে, দেশভাগের কয়েক বছর বাদে ঢাকা থেকে বাবাদের সঙ্গে সে-ও কলকাতায় চলে আসে। তার জন্মের ঢের আগে থেকেই নিধু জ্যাঠা তাদের বাড়িতে আছে। তবে তার খরচ সে নিজেই চালায়। কলেজ স্ট্রীটে একটা বড় বইয়ের দোকানে কী একটা কাজ করে। তাতে যা মাইনে পায় তার প্রায় সবটাই মাসের শেষে বাবার হাতে তুলে দেয়। তাতে রাজাদের যথেষ্ট উপকার হয়। দিনে সাত-আট কাপ চা ছাড়া আর কোনো নেশা নেই। সবাই তাকে ভালবাসে। ছোটদের যত আবদার তার কাছে।

রাজা আরো শুনেছে ঢাকায় থাকতে দুর্দান্ত স্পোর্টসম্যান ছিল নিধু জ্যাঠা। বিখ্যাত উয়াড়ি ক্লাবের সে ছিল বাঘা রাইট আউট। তখন ঢাকায় ক্রিকেট খেলাটা তেমন একটা হত না। তবু উৎসাহ কম ছিল না। ওরই মধ্যে ব্যাট-ট্যাট কিনে প্র্যাকটিশ করত।

পৃথিবীতে যত বড় বড় ফুটবল আর ক্রিকেট খেলা হয়েছে তার সমস্ত রেকর্ড নিধু জ্যাঠার মুখস্থ। তার কাছেই রাজা শুনেছে টেস্ট

ম্যাচে কে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মেরেছে, কে বেশি ক্যাচ ধরেছে, কোন দেশে সবচেয়ে বেশি অল রাউণ্ডার পাওয়া গেছে, ইত্যাদি। ফুটবলের গল্প শুরু হলে তো রাতের পর রাত কাবার করে দিতে পারে নিধু জ্যাঠা। পেলে, লেভ ইয়াসিন, গ্যারিঞ্চা বা জার্ড মুলার থেকে পাওলো রোসি পর্যন্ত কে কীভাবে গোল করে, কার খেলার স্টাইল কী রকম—বলতে বলতে তার চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে।

এতক্ষণে বাঁ দিকে রেড রোড, নেতাজীর স্ট্যাচু, দেশবন্ধুর মূর্তি রেখে আকাশবাণী ভবনের সামনে এসে পড়ল রাজারা। এখানে বাঁশের খুঁটি পুঁতে নানা গেটের দিকে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চারদিকে প্রচুর পুলিশ। একজন পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করে সাত নম্বর গেটের হদিসটা জেনে নিল নিধু জ্যাঠা।

মিনিট পনেরর ভেতর দেখা গেল, ক্লাব হাউসের ডান দিকে সিমেন্টের গ্যালারিতে তারা সীট খুঁজে বসে পড়েছে। বাড়ি থেকে আসার সময় দুপুরে খাবার জন্য মা লুচি আলুভাজা ডিমসেদ্ধ আর কমলালেবু দিয়েছিল। খাবারগুলো একটা কাপড়ের সাইড-ব্যাগে পুরে নিয়ে এসেছে নিধু জ্যাঠা। ব্যাগটা এখন তার কোলে।

এখনও খেলা শুরু হয়নি। সবে সাড়ে ন'টা। আরো আধ ঘণ্টা বাদে ঠিক দশটায় টস হবে, তারপর তো খেলা।

রাজা মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। তাদের বাঁ পাশে ক্লাব হাউস। তারপর থেকে গোল মাঠটাকে ঘিরে স্টেডিয়ামের অনেকগুলো ব্লক। ব্লকগুলোতে এখন শুধু মানুষ আর মানুষ। অসংখ্য গেট দিয়ে আরো অনেকে আসছে। কোথাও এক ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা থাকবে না, খেলা শুরু হবার আগে স্টেডিয়াম বোঝাই হয়ে যাবে।

পশ্চিম দিকের ব্লকগুলোর পেছনে ইডেন গ্যার্ডেনের উঁচু উঁচু গাছ, আরো দূরে হাইকোর্টের চুড়ো দেখা যাচ্ছে।

এতদিন রাজা তার বন্ধু বুবুনদের টিভিতেই রঞ্জি স্টেডিয়াম দেখেছে।

এখন নিজের চোখে সব দেখতে পাচ্ছে। এত মানুষ, তাদের নানা রঙের পোশাক, মাথার টুপি, ক্লাব হাউস, ইডেনের গাছপালা—সমস্ত মিলিয়ে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।

এ বছর শীতটা বেশ জাঁকিয়েই পড়েছে। কনকনে হাওয়া ইডেন গার্ডেনের ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই ছুটে যাচ্ছে। হাওয়াটা এত ঠাণ্ডা, মনে হয় হিমালয়ের বরফ গায়ে মেখে নেমে এসেছে। অবশ্য রোদও উঠেছে চমৎকার। উষ্ণ সোনালি রোদ আর ঠাণ্ডা বাতাসে শীতের সকালটি দারুণ লাগছে।

চারপাশের মানুষেরা আজকের খেলাটার ব্যাপারে নানা রকম মন্তব্য করে যাচ্ছে।

একজন বলল, 'গাভাসকার টপ ফর্মে আছে। ইডেনে ডাবল সেঞ্চুরি করবে।'

আরেক জন বলল, 'কচু করবে। কাওয়ানস আর এডমণ্ডসকে ঠেকিয়ে কুড়িটা রান আগে করুক। তারপর বলবেন—'

তৃতীয় লোকটি বলল, 'এই নতুন ছেলেটা, মানে আজাহারউদ্দিন সম্পর্কে কী মনে হয়?'

চতুর্থ লোকটি বলল, 'আমার ধারণা, খুব ভাল খেলবে। ওকে পাওয়াতে ইণ্ডিয়ার মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের সমস্যা অনেকটাই মিটে যাবে।'

পঞ্চম লোকটি বলল, 'ইংল্যাণ্ডের ল্যাম্ব আর গ্যাটিং দুর্দান্ত খেলছে এই সীজনটা। এখানকার টেস্টের রেজাল্ট কী হবে কে জানে।'

রাজারা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে পাঁচ রো নিচের সীট থেকে একটা লোক অনবরত চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'এই আইসক্রিম, এই পটেটো চীপস, এই চিউয়িং গাম, এই পপ কর্ন, ইধর আও—' অর্থাৎ সামনে দিয়ে যে ফেরিওলা যা-ই নিয়ে যাক তাকেই ডাকছে লোকটা।

রাজার বাঁ পাশের সীটে এক মহিলা স্টেডিয়ামে ঢুকেই ব্যাগ

থেকে উলের গোলা বার করে সোয়েটার বুনে চলেছেন। তাঁর ডান ধারে এক বেজায় মোটা মারোয়াড়ি আরেক জনের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোতে শুরু করেছে। খুব সম্ভব উল বোনা আর ঘুমোবার মতো জরুরি কাজের জন্যই তাদের এখানে আসা।

রাজা কিন্তু এসব কিছুই শুনছিল না, বা লক্ষ্যও করছিল না। সে শুধু স্বপ্নের ঘোরে পুরো স্টেডিয়ামটা বার বার দেখছে।

হঠাৎ পাশ থেকে নিধু জ্যাঠা ডাকল, 'রাজা—'

অন্যমনস্কর মতো সাড়া দিল রাজা, 'উ—'

'নোট বইটা এনেছিস ?'

একটা তিন ইঞ্চি বাই দু ইঞ্চি মাপের ছোট-সবুজ মলাটের নোট বই রাজাকে দিয়েছে নিধু জ্যাঠা। ওটাতে পেলে গ্যারিঞ্চা বেকেন-বাউয়ার থেকে শুরু করে মারাদোনা ফ্রান্সিস কোলি ইউসোবিও পর্যন্ত ফুটবলের বাঘা বাঘা খেলোয়াড়দের গোল করার কায়দা যেমন লেখা আছে তেমনি ভিভ রিচার্ডস, ব্রাডম্যান, উইকস, গাভাসকার ইত্যাদি ক্রিকেটের বড় বড় স্টাররা কে কীভাবে স্ট্রোক করেন তার নিখুঁত বর্ণনাও নোট বইটিতে পাওয়া যাবে। ক্রিকেট এবং ফুটবলের দারুণ কিছু ঘটলেই রাজার সবুজ নোট বুকে তা উঠে যায়।

রাজা ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'এনেছি।'

'ভেরি গুড। যখনই কারো ভালো স্ট্রোক কি বোলিং দেখবি তক্ষুণি টুকে রাখবি।'

মুখে কিছু না বলে আবার ঘাড় কাত করে রাজা।

কাঁটায় কাঁটায় দশটায় পেঙ্গুইন পাখির মতো ঢলঢলে কালো কোট-পরা দুই আম্পায়ার এবং দু'দলের ক্যাপ্টেন সুনীল গাভাসকার আর ডেভিড গাওয়ার মাঠের মাঝখানে টস করতে এলেন। টসে জিতে ইণ্ডিয়া ব্যাটিং নিল। গাওয়ার এবং গাভাসকার ক্লাব হাউসে ফিরে গেলেন। আম্পায়াররা মাঠেই থেকে গেলেন।

একটু পরেই গাওয়ার তাঁর টীম নিয়ে ফিল্ডিং করতে এলেন।

গাভাসকার তাঁর পার্টনার গাইকোয়াড়কে নিয়ে এলেন ব্যাটিং করতে।

সবুজ কার্পেটের মতো গোল মাঠে ধপধপে সাদা ট্রাউজার্স শার্ট পরা এগার জন ফিল্ডার, দু'জন ব্যাটসম্যান আর কালো কোট-পরা দু'জন আম্পায়ার ছাড়া আর কেউ নেই।

এতদিন টিভিতে আর স্বপ্নে রাজা যাদের দেখেছে, এখন তারা একেবারে চোখের সামনে। উত্তেজনায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছে তার, চোখের পলক পড়ছে না।

গাভাসকার আর গাইকোয়াড় কিন্তু বেশিক্ষণ ব্যাট করতে পারলেন না, অল্প রান করেই এডমণ্ডস এবং কাওয়ানসের বলে কট আউট হয়ে গেলেন।

কাওয়ানস দুর্দান্ত 'বল' করছিলেন। নিধু জ্যাঠা পাশ থেকে ফিসফিস করে বলল, 'কাওয়ানসের বল করার কায়দাটা টুকে নে।'

রাজা নোট বই আর ডট পেন বার করেই রেখেছিল। তক্ষুণি লিখে ফেলল।

গাভাসকার এবং গাইকোয়াড়ের পর এলেন বেঙ্গসরকার আর অমরনাথ। বেঙ্গসরকার এবং অমরনাথের দুটো স্ট্রেট ড্রাইভ, একটা স্কোয়ার কাট আর একটা সুইপের বর্ণনা লিখে নিল রাজা।

বেঙ্গসরকার এবং অমরনাথ জুটি আউট হলে এলেন রবি শাস্ত্রী আর আজাহারউদ্দিন। তাঁদের কত লেট কাট, অন ড্রাইভ, পুল আর কভার ড্রাইভের বিবরণ যে রাজার নোট বুকে টোকা হতে লাগল তার ঠিক নেই।

একসময় প্রথম দিনের খেলা শেষ হলো।

এরপর আরো চার দিন নিধু জ্যাঠার সঙ্গে ইডেনে এল রাজা। ইণ্ডিয়ার প্রথম ইনিংস সাত উইকেটে চারশ সাঁইত্রিশ রানে ডিক্লেয়ার করে দেওয়া হলো। ইংল্যাণ্ড আউট হলো দুশো ছিয়াত্তর রানে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ ড্র হয়ে গেল।

এর মধ্যে মাইক গ্যাটিং আর অ্যালান ল্যাম্বের হাঁটু মুড়ে পুল, সুইপ, ড্রাইভ, চেতন শর্মা, শিবরামকৃষ্ণণ ও শিবলাল যাদবের বোলিং-এর স্টাইল, ডেলিভারি, সব টুকে নিয়েছে রাজা।

১৯৮৫-এর পাঁচই জানুয়ারি খেলা শেষ হবার ঘন্টাখানেক আগে পাশ থেকে নিধু জ্যাঠা হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা রাজা—'

পাঁচ দিন ধরে রাজার চোখ মাঠের মাঝখানেই আটকে আছে। মুখ না ফিরিয়ে সে বলল, 'কী বলছ ?'

'স্টেডিয়ামে সবসুদ্ধু কত লোক আছে বল্ তো—'

'খবরের কাগজে লিখেছে আশী হাজার।'

'এর মধ্যে কত বাঙালী আছে, মনে হয় ?'

'বলতে পারব না।'

একটু ভেবে নিধু জ্যাঠা বলল, 'ধর মিনিমাম সত্তর হাজার।'

রাজা উত্তর দিল না।

নিধু জ্যাঠা এবার বলল, 'সত্তর হাজার লোকের হাত কতগুলো ?'

রাজা হতভম্বের মতো বলল, 'তুমি কি খেলা দেখতে এসে গুণ অঙ্কের ক্লাস বসাতে চাইছ ?'

'বল্ না—'

'একজন মানুষের দুটো করে হাত হলে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার।'

'রাইট। ভেবে ছাখ, কেউ ভাল ব্যাট, বল বা ফিল্ডিং করলে সত্তর হাজার বাঙালী একলাখ চল্লিশ হাজার হাতে হাততালি দিচ্ছে। দিচ্ছে কিনা ?'

মাঠের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে বিমূঢ়ের মতো তাকালো রাজা। বলল, 'হ্যাঁ দিচ্ছে।'

'এবার বল্ মাঠে কত জন প্লেয়ার খেলছে ?'

'দু দলের বাইশ জন।'

'তাদের ভেতর ক'জন বাঙালী ?'

'একজনও না।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর খুব আস্তে আস্তে, অথচ বেশ জোর দিয়ে নিধু জ্যাঠা বলল, 'আর কেউ পারুক, আর না-ই পারুক, তোকে অন্তত মাঠের মাঝখানে ওই বাইশ জনের একজন হতে হবে।'

রাজা চমকে উঠল, 'কীভাবে?'

'লেখাপড়ার সঙ্গে ক্রিকেট প্র্যাকটিশ করে করে, ভাল খেলা শিখে।'

'শিখব কী করে? আমার কি প্যাড আছে? ব্যাট, উইকেট, গ্লাভস, ডিউস বল আছে?'

'ঠিক বলেছিস।' খানিকক্ষণ চিন্তা করে নিধু জ্যাঠা বলল, 'দেখি কী করা যায়।'

টেস্ট ম্যাচ শেষ হবার মাসখানেক বাদে একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ভীষণ অবাক হয়ে গেল রাজা। যতটা অবাক, ততটাই খুশি। নিধু জ্যাঠা নতুন ব্যাট, লাল টুকটুকে ডিউস বল, প্যাড, উইকেট আর গ্লাভস কিনে এনে তার জন্য অপেক্ষা করছে।

রাজার বাবাও হঠাৎ শরীর খারাপ হওয়ায় আজ তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসেছেন। তিনি বললেন, 'নিধুদা, এত টাকা খরচ করে এসব কিনতে গেলে কেন?'

নিধু জ্যাঠা বাবাকে বলল, 'এ নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না ভজন।' রাজার বাবার ডাকনাম ভজন।

'কিন্তু টাকাগুলো পেলে কোথায়? নিশ্চয়ই ধার-টার করেছ?'

'যা ভাল বুঝেছি, করেছি। তোর শরীর ভাল না, শুয়ে থাক গিয়ে।'

বাবা তাঁর এই একরোখা জেদী দাদাটিকে ভাল করেই চেনেন। আর একটি কথাও না বলে তিনি অন্য ঘরে চলে গেলেন।

নিধু জ্যাঠা বলল, 'তা হলে কাল থেকেই প্র্যাকটিশ শুরু করা

যাক। ভাবছি তোর সঙ্গে আমিও নতুন করে আরম্ভ করব। ভোর-বেলা উঠে আড়াই ঘণ্টা পড়ে নিবি, তারপর এক ঘণ্টা প্র্যাকটিশ। মাঠ থেকে ফিরে আধ ঘণ্টা রেস্ট। রেস্টের পর স্নান করে খেয়ে স্কুল। আর আমি চলে যাব কলেজ স্ট্রীটে। কাল থেকে এই হবে আমাদের রোজকার রুটিন। ঠিক আছে?'

রাজা মাথা হেলিয়ে জানালো, 'ঠিক আছে।'

'মনে রাখবি, ইডেন গার্ডেনে মাঠের ভেতর যে বাইশ জনকে দেখেছিস তার একজন তোকে হতেই হবে।'

রাজা বলল, মনে রাখবে।

পরদিন সকালে ব্যাট প্যাড-ট্যাড নিয়ে ঠিক আটটায় রাজা আর নিধু জ্যাঠা চলে গেল কাছাকাছি একটা পার্কে। সেখানে ঘাস-টাস বলতে কিছু নেই। চারদিক গর্তে বোঝাই। এখানে ক্রিকেট প্র্যাকটিশ অসম্ভব।

নিধু জ্যাঠা বলল, 'চল, অন্য জায়গায় যাই।'

খানিকটা দূরে আরেকটা পার্কে এসেও কাজের কাজ কিছুই হলো না। সি. এম. ডি. এ'র কী সব কাজকর্ম হচ্ছে এদিকে, যার জন্য পার্কটায় অগুনতি গুদাম বানিয়ে মালপত্র রাখা হয়েছে। দশ ইঞ্চি জায়গাও এখানে ফাঁকা পড়ে নেই।

এবার রাজারা গেল আরো দূরের একটা পার্কে। সেটা পাতাল রেল দখল করে রেখেছে। এখানেও বিরাট বিরাট গোডাউন। সেগুলো সিমেন্ট বালি লোহার রড এবং নানারকম ভারী ভারী যন্ত্রপাতিতে বোঝাই।

রাজার স্কুল আর নিধু জ্যাঠার কাজে যাবার সময় হয়ে আসছিল। ওরা বাড়ি ফিরে এল। ঠিক হলো, পরের দিন আবার মাঠের খোঁজে বেরুবে।

কিন্তু পরের দিনও খেলার মাঠ পাওয়া গেল না। সব পার্কই হয় সি. এম. ডি. এ. নয় পাতাল রেল কিংবা হকার আর ভিখিরিরা

দখল করে রেখেছে।

চারদিন ঘোরাঘুরির পর একটা পার্ক পাওয়া গেল কিন্তু সেখানে বদমাশ বাজে ছোকরাদের আড্ডা। রাজাদের উইকেট পুঁততে দেখে তারা তেড়ে এল, 'এখানে খেলা-ফেলা চলবে না। ভাগ—'

রাজা হতাশ হয়ে পড়ল। কিন্তু নিধু জ্যাঠা ভেঙে পড়ার মানুষ না। খবর নিয়ে সে জানতে পারল, ওই ছোকরাগুলো সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত পার্কে বসে থাকে। সারাক্ষণ নেশাটেশা করে। ওরা পারে না, এমন নোংরা কাজ নেই। ওদের জন্য সন্ধে পর্যন্ত কেউ পার্কে ঢুকতে পারে না। তবে সন্ধের পর ঠাণ্ডাটা যখন আরো কয়েক গুণ বেড়ে যায় তখন ওরা পার্ক থেকে চলে যায়।

এই পার্কটার ভেতরে এবং চারদিকের রাস্তায় কর্পোরেশন প্রচুর তেজী আলো লাগিয়ে দিয়েছে। এত আলো যে একটা আলপিন পড়লে খুঁজে নেওয়া যায়।

নিধু জ্যাঠা আর রাজা ঠিক করে ফেলল, রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর আলোয় ঝলমলে ফাঁকা পার্কে তারা প্র্যাকটিশ করতে আসবে। ঠাণ্ডাটা তখন একটু বেশিই থাকবে কিন্তু কী আর করা যাবে। ক্রিকেট তো শীতেরই খেলা। তা ছাড়া ইংল্যাণ্ডে গেলে তো এর থেকে অনেক বেশি ঠাণ্ডায় খেলতে হবে।

পরদিন রাত থেকেই আলোকিত ফাঁকা মাঠে সত্তর বছরের একজন বোলার বারো বছরের এক ব্যাটসম্যানকে বল করতে থাকে। চারদিক নিঝুম, মাথার ওপর জানুয়ারির হিম পড়ে যাচ্ছে অবিরাম। কিন্তু দুই ক্রিকেটারের সে ব্যাপারে হুঁশ নেই। সারা পৃথিবীকে ভুলে গিয়ে তারা প্র্যাকটিশ করে চলেছে।

নিধু জ্যাঠা বল করতে করতে বলে, 'এই একটা লেগ স্পিন দিলাম। সুইপ কর—'

রাজা ব্যাট চালায়।

নিধু জ্যাঠা হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'হলো না, হলো না। ল্যাম্ব

শিবরামকৃষ্ণণের বলে হাঁটু মুড়ে কীভাবে সুইপ করেছিল, ভেবে নে—' বল কুড়িয়ে এনে আবার ডেলিভারি দিতে গিয়ে বলল, 'আবার লেগ স্পিন দিচ্ছি। ট্রাই এগেন—'

এইভাবে রাতের পর রাত দু'জনে প্র্যাকটিশ করে যায়। ইডেন গার্ডেনে বাইশ জন টেস্ট খেলোয়াড়ের মধ্যে একজন হতে পারবে কিনা, রাজা জানে না। কিন্তু চেষ্টা তো করে যেতে হবে।

নকুড়চন্দ্র চাকলাদারকে তোমরা চেনো না। চেনার কথাও নয়। তিনি তো আর আব্রাহাম লিঙ্কন, গান্ধীজি, নেতাজী কি রবীন্দ্রনাথের মতো বিখ্যাত কেউ নন।

আমিও তাঁকে চিনতাম না। দু মাস আগে পাটনা থেকে বদলি হয়ে যেই তিনি আমাদের অফিসে এলেন তার তিন দিনের মধ্যে জানতে পারলাম তিনি এসে গেছেন।

আমাদের অফিসটা বিরাট। পেল্লায় একখানা সাত তলা বাড়িতে ছ'শো লোক কাজ করে। আমার ঘর চার তলায়।

খবর রটে গেল নকুড়বাবুর মতো খাইয়ে লোক নাকি ইণ্ডিয়াতে আর দ্বিতীয়টি নেই। আমাদের অফিসের চারপাশে যত খাবারের দোকান আছে, সেগুলোতে যত ইডলি দোসা এগরোল আর তেলে-ভাজা বানানো হয় তার সিকি ভাগই নাকি তিনি খেয়ে ফেলছেন।

আরো জানা গেল, তিনি কলকাতায় চলে আসার পর পাটনায় নাকি দুটো খাবারের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। ঐ দুটো দোকানের যত লাড্ডু গুলাবজাম কলাকন্দ আর প্যাঁড়া তিনি একাই নাকি কিনে নিতেন। নকুড়বাবু চলে আসায় দুই দোকানদার খুবই কান্নাকাটি করছে। শোনা যাচ্ছে তারা কলকাতায় এসে অফিসের বড় কর্তাদের হাতে-পায়ে ধরে ফের নকুড়বাবুকে পাটনায় নিয়ে যেতে চেষ্টা করবে।

আরো জানতে পারলাম, নকুড়বাবুর কেউ নেই। বাবা মা ভাই বোন, কেউ না। বিয়ে পর্যন্ত করেন নি। শিয়ালদার কাছে এক বন্ধুর বাড়িতে একখানা ছোট ঘরে থাকেন আর যা মাইনে পান, সবই খেয়ে শেষ করে ফেলেন। তাঁর খাওয়ার যা বহর তাতে নাকি মাইনের টাকায় চলে না, মাঝে মাঝেই ধার করতে হয়।

আমাদের ডিপার্টমেন্টের কানাইবাবু গজকেষ্টবাবু ভবতোষবাবু, এমনি অনেকেই নকুড়বাবুর সঙ্গে আলাপ করে এসেছেন। তাঁরা বলেছেন, 'যান যান মশাই, একবার নকুড়বাবুর খাওয়া দেখে আসুন। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না মানুষ যে এত খেতে পারে!'

লোকটাকে দেখার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল। আজকাল তো আর খাইয়ে লোক তেমন চোখে পড়ে না। চারখানার জায়গায় ছ'খানা লুচি আর দু-হাতা মাংস খেলেই লোকের পেট আইঢাই করতে থাকে। তিনদিন খাওয়া-দাওয়া বন্ধ রাখতে হয়। এখনকার মানুষজনের পেট খুব ছোট হয়ে গেছে। তাতে খাবার দাবার খুব কম ধরে।

নকুড়বাবুর কাছে যাই যাই করে পনের দিন কেটে গেল। অফিসে ভীষণ কাজের চাপ চলছিল। শেষ পর্যন্ত একদিন তাঁর ঘরে চলেই এলাম।

আগেই খবর পেয়েছিলাম, নকুড়বাবু বসেন এক তলায়। তাঁর ঘরে আসতেই চোখে পড়ল গোলগাল, টুকটুকে ফর্সা একটি লোক খালি গায়ে চেয়ারে বাবু হয়ে বসে আছেন, আর দর দর করে

ঘামছেন। সময়টা গরমকাল কিনা, তাই এত ঘাম।

যতই গরম পড়ুক, কেউ যে জামা-গেঞ্জি খুলে অফিসে বসে থাকতে পারে, আগে কখনও দেখি নি। ভদ্রলোকের সামনে বড় টেবল। টেবলের এধারে চেয়ারে আরো তিনজন বসে আছেন। এঁদের আমি চিনি, এঁরা আমাদের অফিসেই কাজ করেন।

খালি গায়ের লোকটি যে নকুড়বাবু, বলে দিতে হল না। আমাকে দেখেই হাতজোড় করে বললেন, 'আসুন আসুন। নমস্কার।'

'নমস্কার।' বলে টেবলের কাছে চলে এলাম।

'বসুন বসুন।'

একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম।

নকুড়বাবু বললেন, 'আমাকে দেখতে এলেন বুঝি! আমার খাওয়া-দাওয়ার কথা নিশ্চয়ই কেউ আপনাকে শুনিয়েছে।'

কেন এসেছি, নকুড়বাবু ঠিক ধরে ফেলেছেন। কিন্তু সে কথা তো মুখের ওপর বলা যায় না। একটু আমতা আমতা করে বললাম, 'আপনি আমাদের এই অফিসে নতুন এসেছেন। তাই আলাপ করতে এলাম।'

নকুড়বাবু লোকটা পয়লা নম্বরের বিচ্ছু। হেসে হেসে বললেন, 'না মশাই, আলাপ-টালাপ করতে না, আপনি আসলে এসেছেন আমার খাওয়া-দাওয়া দেখতে।' একটু থেমে ফের বললেন, 'সবাই তাই দেখতে আসে কিনা, তাই বললাম। কিছু মনে করবেন না।'

বললাম, 'না না, মনে করব কেন?'

এরপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার নাম, অফিসের কোন তলায় বসি, কোন ডিপার্টমেণ্টে কাজ করি—এই সব জিজ্ঞেস করলেন নকুড়বাবু। আমি উত্তর দিতে লাগলাম।

আমাদের কথাবার্তার মধ্যে সামনের দেয়ালের বড় ঘড়িটায় টং টং করে তিনটে বাজল। সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠলেন নকুড়বাবু। দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'কেষ্ট কেষ্ট।' কেষ্ট

নকুড়বাবুর বেয়ারা।

কেষ্টকে চিনি। এই অফিসে অনেকদিন কাজ করছে। ফড়িংয়ের মতো রোগা টিঙটিঙে চেহারা। মুখ বোতলের মতো লম্বা। মাথার চুল খাড়া খাড়া, দাড়ি-গোঁফ পিনের মতো ফুটে আছে। গোল গোল চোখদুটো সবসময় বাঁই-বাঁই করে ঘুরছে। দেখেই বোঝা যায়, তার মাথায় সারাক্ষণ শয়তানির কারখানা চলছে।

লোকটার বয়স বোঝা যায় না। তিরিশ হতে পারে, পঁয়ত্রিশ হতে পারে, আবার চল্লিশ হলেই বা আটকাচ্ছে কে?

দরজার পাশের টুল থেকে উঠে প্রায় দৌড়েই নকুড়বাবুর কাছে চলে এল কেষ্ট। ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'বলুন স্যার—'

দেয়াল ঘড়ির দিকে আঙুল বাড়িয়ে নকুড়বাবু বললেন, 'ক'টা বাজল খেয়াল আছে?'

'আছে স্যার। আপনি না ডাকলেও আমি ঠিক চলে আসতাম। দিন—' বলে হাত পাতল কেষ্ট।

টেবলের ড্রয়ার থেকে মানিব্যাগ বার করতে করতে নকুড়বাবু বললেন, 'তোমাদের এখানে রাবড়ি কত করে কিলো?'

'তিরিশ টাকা স্যার।'

গুনে গুনে নগদ তিরিশটি টাকা পঁচিশ পয়সা, কেষ্টর হাতে দিয়ে নকুড়বাবু বললেন, 'যাও, এক কিলো নিয়ে এসো। বেশি দেরি করবে না। ওই সঙ্গে জর্দা দিয়ে একটা পান এনো।'

'আচ্ছা স্যার।' কেষ্ট এক সেকেণ্ডও আর দাঁড়াল না, ছুটে বেরিয়ে গেল।

নকুড়বাবু এবার আমাদের দিকে ফিরে হে হে করে একটু হাসলেন। তারপর বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, তিনটের সময় আমি টিফিন করি। গল্প করতে করতে খাওয়া যাবে'খন, কি বলেন—'

একটু লোভ হল, এক কিলো রাবড়ি যখন আসছে তখন তার থেকে একটু আধটু ভাগ কি আর পাওয়া যাবে না?

আমার আগে নকুড়বাবুর ঘরে এসে বসে ছিলেন অবিনাশবাবু, নরেনবাবু আর ললিতবাবু। আমরা সবাই একসঙ্গে মাথা নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'ধন্যবাদ।' বলে নকুড়বাবু টেবলের ড্রয়ার থেকে ধবধবে ফর্সা তোয়ালে বার করে উঠে পড়লেন, 'দয়া করে আপনারা একটু বসুন। আমি হাতমুখ ধুয়ে আসি।'

'আসুন।'

নকুড়বাবুর ঘরের পাশেই বাথরুম। তিনি সেখানে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে নকুড়বাবু গেঞ্জি আর পাঞ্জাবি পরে ভাল করে চুল আঁচড়ে নিলেন। বললেন, 'খাওয়া-দাওয়া একটা খুব পবিত্র ব্যাপার। যেমন তেমন করে খেলে হয় না। শুদ্ধ মনে শুদ্ধ পোশাকে খেতে হয়। তবেই না খাওয়াটা খাওয়ার মতো হয়।'

এমন কথা আগে আর কখনও শুনিনি। আমরা বোকার মতো ঘাড় কাত করে সায় দিলাম, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই।'

ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে কেষ্ট রাবড়ির একটা হাঁড়ি আর কলাপাতায় মোড়া পানের খিলি নিয়ে এল। রাবড়ি আর পান টেবলে রেখে বলল, 'জল এনে দিই ?'

'দাও।' নকুড়বাবু এবার আমাদের দেখিয়ে বললেন, 'এঁদের জন্যে চা আর বিস্কুট এনো।'

কেষ্ট কাচের গেলাসে জল দিয়ে, চা-বিস্কুট আনতে চলে গেল।

নকুড়বাবু রাবড়ির হাঁড়ির মুখটা খুলতে খুলতে বললেন, 'হেঁ হেঁ, রাবড়ি দেখে আপনাদের হয়ত চেখে দেখার একটু ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু কিছু মনে করবেন না, প্রাণ গেলেও কিন্তু রাবড়ির ভাগ আপনাদের দিতে পারব না। রাবড়িটা আমি খুব ভালবাসি কিনা।'

রাবড়ির হাঁড়ি দেখে যে আশাটুকু হয়েছিল, নকুড়বাবু এক ফুঁয়ে তা নিভিয়ে দিলেন। কী আর করা, উনি যদি না দ্যান, আমরা তো
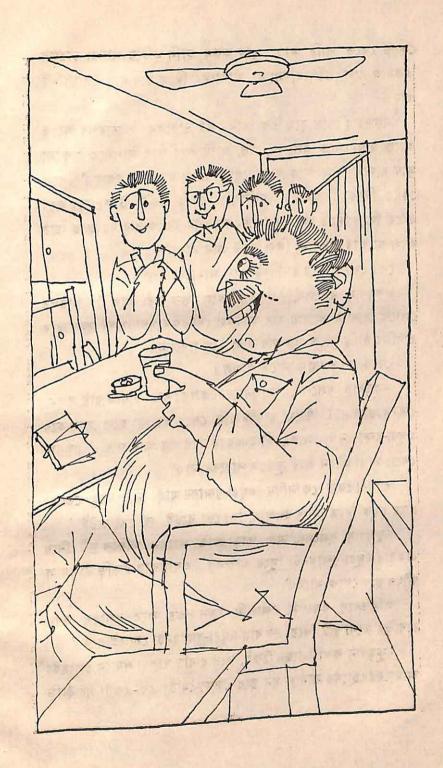
কেড়ে খেতে পারি না। মুখে করুণ হাসি ফুটিয়ে আমরা চারজন একসঙ্গে বলে উঠলাম, 'না না, আমাদের দিতে হবে না। আপনিই খান।'

নকুড়বাবু চোখ বুজে এক মিনিট কী ভাবলেন। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললেন, 'উঁহু, আমি খাব আর আপনারা শুকনো মুখে সামনে বসে থাকবেন, সেটা ভীষণ খারাপ দেখায়।' বলে কেষ্টর দিকে ফিরলেন। মানিব্যাগ থেকে একটা টাকা বের করে তাকে দিতে দিতে বললেন, 'যাও, ক্যানটীন থেকে বাবুদের জন্যে চার কাপ চা আর চারখানা থিন বিস্কুট এনে দাও।'

কেষ্ট দৌড়ে গিয়ে চা-বিস্কুট এনে আমাদের দিল।

নকুড়বাবু বললেন, 'এবার তা হলে শুরু করা যাক।' তারপর লোকে যেভাবে পুজোয় বসে অবিকল সেইরকম মুখচোখের ভাব করে রাবড়ির হাঁড়ি থেকে পুরু সর তুলে মুখে পুরলেন।

খেতে খেতে গল্পও চলতে লাগল।

নকুড়বাবু বললেন, 'আপনাদের কলকাতার রাবড়ি যাই বলুন, তেমন ভাল না। উত্তম রাবড়ি যদি খেতে হয়, তা হলে যেতে হবে মথুরা-বৃন্দাবনে। আহা, কী চমৎকার তার গন্ধ আর স্বাদ! একবার খেলে সারা জীবন আর ভুলতে পারবেন না।'

আমরা কেউ কোনদিন মথুরা-বৃন্দাবন যাই নি। তবু তেতো চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললাম, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই।'

নকুড়বাবু বললেন, 'যত তাড়াতাড়ি পারেন অফিসে ছুটি নিয়ে একবার মথুরা-বৃন্দাবনটা ঘুরে আসুন। ওখানকার রাবড়ি না খেলে ভীষণ দুঃখ থেকে যাবে।'

ললিতবাবু বললেন, 'আপনি যখন এত করে বলছেন তখন রাবড়ির জন্যে ছুটি নিয়ে একবার মথুরা-বৃন্দাবনটা যেতেই হবে।'

নকুড়বাবু কথা বলছেন ঠিকই, তবে রাবড়ি খাওয়া সমানে চলছেই। আমাদের চোখের সামনে ঘন দুধে ভেজা মোটা এক-একটা সর হাঁড়ি

থেকে তুলে, নাচিয়ে নাচিয়ে মুখে পুরছেন। মাঝে মাঝে হাঁড়িটা মুখের কাছে এনে একটু কাত করে সুড়ুত করে চুমুক দিচ্ছেন।

একবার খাওয়াটা কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ রেখে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে নিলেন। আমরা দেখলাম রাবড়ির হাঁড়ি অর্ধেক ফাঁকা হয়ে গেছে।

বুঝতে পারলাম এখন খাওয়ার ব্যাপারে ইন্টারভ্যাল চলছে। নকুড়বাবু বললেন, 'মথুরা-বৃন্দাবন যখন যাবেন তখন দেওঘরের কথাটাও মনে রাখবেন। ওখানকার প্যাঁড়ার তুলনা নেই। ওটা চেখে না দেখলে জীবনে বড় আপশোষ থেকে যাবে।'

আমরা মাথা নেড়ে বললাম, 'নিশ্চয়ই, দেওঘরের প্যাঁড়ার কথা আমাদের মনে থাকবে।'

নকুড়বাবু বলতে লাগলেন, 'তারপর ধরুন মিহিজামের কলাকন্দ, লখনৌয়ের বাদাম বরফি। এ সব না খেলে বেঁচে থাকার সুখ নেই।'

আমরা চারজন তেতো কালচে চায়ে চুমুক দিতে দিতে তক্ষুনি সায় দিলাম—সত্যিই সুখ নেই।

নকুড়বাবু নড়েচড়ে বসে এবার বললেন, 'জানেন, আমি একবার ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে ছিলাম। কেন বলতে পারেন ?'

হচ্ছিল বরফি কলাকন্দের কথা, তার মধ্যে হঠাৎ ভারত ভ্রমণটা কেন নিয়ে এলেন নকুড়বাবু, বুঝতে পারছি না। আমরা বোকার মতো তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে বললাম, 'না তো।'

হেঁ হেঁ করে হেসে হেসে নকুড়বাবু বললেন, 'স্রেফ নানা রকম খাবার চেখে দেখতে। আমাদের এই দেশে কত রকম মিঠাই, কত রকম মাংসের খাবার আর নিরামিষ খাবার আছে, ভাবতে পারবেন না। দিল্লীতে চলে যান, সেখানে পাবেন মোগলাই আর পাঞ্জাবি খানা—পোলাও, কোর্মা থেকে পালং-পনীর, সোহন হালোয়া, শন-পাপড়ি, চানা-বাটোরা, ক্রিম-মটর। হায়দ্রাবাদে যান, পাবেন কাবাব। কাবাব কি একরকমের ! টিকিয়া কাবাব, গুলি কাবাব, শিক

কাবাব। বেনারস যান—পাবেন মেওয়া, মালাই। জয়পুর যান—সেখানে যে কত রকমের ভাজিয়া তার ঠিক নেই। তবে মশাই সাউথ ইণ্ডিয়ায় তেমন জুত পাবেন না। কাঁহাতক আর ইডলি দোসা খাওয়া যায় বলুন। তবে গোয়ায় যেতে ভুলবেন না। ওখানকার কুকেরা তো ওয়াল্ড´ ফেমাস—জগদ্বিখ্যাত। ওদের ধনেপাতা দিয়ে মুরগির মাংস যে না খেয়েছে সে জানে না তার কত বড় ক্ষতি হয়ে গেছে।' বলতে বলতে হু'চোখ জ্বল জ্বল করতে থাকে নকুড়বাবুর। খাবার-গুলোর নাম করতে করতে জিভে জল এসে গিয়েছিল, সুড়ুত করে টেনে নিয়ে গিলে ফেললেন।

আমরা হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

নকুড়বাবু থামেন নি। একটানা বলতে লাগলেন, 'ভাববেন না, আপনারা যখন ভারত ভ্রমণে বেরুবেন তখন একটা চার্ট করে দেব। কোথায় গিয়ে কোন হোটেলে বা ধর্মশালায় উঠবেন, কোন দোকানে ভাল রাবড়ি, কোন রেস্তোরাঁয় বেস্ট কাবাব পাওয়া যায়, সব তাতে লেখা থাকবে। চার্টটা হাতে থাকলে আপনাদের এতটুকু অসুবিধা হবে না।'

আমরা ঘাড় নেড়ে জানালাম—নকুড়বাবু চার্ট করে দিলে অসুবিধা হবে না।

নকুড়বাবু এবার বললেন, 'আরে মশাই, লোকে দেশ ভ্রমণে গিয়ে শুধু পুরনো মন্দির, ভাঙা দুর্গ, পাহাড় পর্বত জঙ্গল লেক—এ সব দেখে বেড়ায়। এগুলো দেখে কী যে লাভ, আমার মাথায় ঢোকে না। তার চেয়ে যেখানে যাবি সেখানকার ভাল ভাল জিনিস চেখে ছাখ, তবেই না জীবন সার্থক হবে! নইলে শুধু শুধু ঘোরাঘুরি করে লাভটা কী?' বলতে বলতে আবার রাবড়ির হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে খেতে শুরু করলেন।

খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতবর্ষের খাবার-দাবারেরও লিস্ট দিয়ে সেগুলোর স্বাদ কেমন, বুঝিয়ে দিতে লাগলেন নকুড়বাবু।

এদিকে আমাদের চোখের সামনে রাবড়ির হাঁড়ি একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। তারপর নকুড়বাবু হাঁড়িটার ভেতর মুখ ঢুকিয়ে জিভ দিয়ে চেটে চেটে সেটার গায়ে যেটুকু রাবড়ি লেগে ছিল, সাফ করে ফেললেন। এখন দেখলে কে বলবে কয়েক মিনিট আগেও ওটার ভেতর পুরো এক কিলো রাবড়ি ছিল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ফাঁকা হাঁড়িটা কেষ্টর হাতে দিয়ে তিনি বাথরুমে চলে গেলেন। মুখটুখ ধুয়ে ফিরে যখন এলেন, তাঁর মুখ-চোখ কুঁচকে গেছে। পেটে হাত বুলিয়ে এবং টিপেটুপে কী যেন বুঝতে চেষ্টা করলেন।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল নকুড়বাবু?'

নকুড়বাবু অন্যমনস্কর মতো বললেন, 'আমার একটা খটকা লাগছে।'

'কিসের খটকা?'

'পরে বলছি।' বলে একটা লম্বা ঢেকুর তুলে টেবিল থেকে জলের গেলাসটা নিয়ে ঢক ঢক করে খেয়ে ফেললেন। তারপর সেই জর্দা-দেওয়া পানের খিলিটা মুখে পুরে বললেন, 'আপনারা প্লিজ বসুন। দয়া করে চলে যাবেন না। আমি একটু ঘুরে আসছি। পনের মিনিটের মধ্যে ফিরে আসব।'

ভদ্রলোকের হঠাৎ কী হল, কিছুই বুঝতে পারছি না। আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। ভাবলাম, দেখাই যাক, পনের মিনিট অপেক্ষা করে।

পনের মিনিট বসতে হল না। তের মিনিট আটাশ সেকেণ্ডের মাথায় নকুড়বাবু ফিরে এসে তাঁর চেয়ারে বসতে বসতে হাঁক দিলেন, 'কেষ্ট—'

কেষ্ট দরজার বাইরে তার টুল থেকে উঠে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

নকুড়বাবু ধীরেসুস্থে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ডান হাতটি পাতলেন। মধুর গলায় বললেন, 'তিনটে টাকা ফেরত দাও ভাই।'

কেষ্ট প্রথমটা চমকে উঠল। তারপর একটি কথাও না বলে সুট করে পকেট থেকে তিনটি টাকা বের করে নকুড়বাবুর হাতে দিয়ে এক দৌড়ে আবার তার টুলে গিয়ে বসে পড়ল।

আমরা হাঁ হয়ে গেলাম। কিছুই মাথায় ঢুকছে না।

নকুড়বাবু আমাদের মনের কথাটা টের পেয়েছিলেন। হেসে হেসে বললেন, 'বুঝতে পারছেন না তো?'

'না—'

টেবলের ওপর দিয়ে আমাদের দিকে ঝুঁকে নকুড়বাবু বললেন, 'আরে মশাই, কেষ্ট এক কিলোর জায়গায় ন'শো গ্রাম রাবড়ি এনেছে। কিন্তু আমার চোখে কি ধুলো দেওয়া কি এতই সোজা।'

ললিতবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'একশো গ্রাম কম এনেছে, বুঝলেন কী করে?'

নকুড়বাবু বললেন, 'আমার পেটে রাবড়ির জন্যে এক কিলোর একটা খোপ আছে। কিন্তু কেষ্ট যে রাবড়িটা আনলো সেটা খেয়ে মনে হল, খোপটা ঠিক ভরে নি, একটু যেন খালি খালি লাগছে। তাই—'

'তাই কী?'

'আপনাদের বসতে বলে বেরিয়ে গেলাম। এখানে তিনটে রাবড়ির দোকান আছে। প্রথম দুটো দোকানে কেষ্টর চেহারার ডেসক্রিসন দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এরকম কেউ এক কিলো রাবড়ি কিনতে এসেছিল কিনা। তারা 'না' বললে, থার্ড দোকানদার জানালো, 'হ্যাঁ'। তবে এক কিলো না, ন'শো গ্রাম নিয়ে গেছে। খাবার-দাবারের ব্যাপারে আমার সঙ্গে চালাকি নয় বাপু। দেখলেন তো আপনাদের চোখের সামনে কেষ্টকে ক্যাঁক করে ধরে কেমন একশো গ্রামের দামটা আদায় করলাম।' বলে খুশিতে গলার ভেতরে গুন গুন করে কী একটা গানের সুর ভাঁজতে লাগলেন।